এডওয়ার্ড লিয়ারের রচনাবলী







আজব বুড়োর আজগুবি সব রঙ্গ
বাসতো ভালো হাসিমুখের সঙ্গ।
লিখলে সে বই ছবি ছড়ায়
ছেলেরা সব হেসে গড়ায়
প'ড়ে ছড়া, দেখে ছবির ঢং গো !

যত সব ননসেন্স

এডওয়ার্ড লিয়ারের রচনাবলী

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অশোককুমার মিত্র

শৈলশেখর মিত্র

প্রকাশক
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ।১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-২৩৮৬

মুদ্রাকর
দেবদাস নাথ
সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা ১২
ফোন : ৩৪-৩৯৬৬

প্রচ্ছদলিপি
বিমল দাস

ভেতরের ছবি
এডওয়ার্ড লিয়ার

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২১, ১৯৭৪

দাম বারো টাকা

গুবলুস আর ভণ্ডুলকে

হলদে সবুজ মেঘের মাচার
গন্ধ যারা ক'রছে পাচার
উড়িয়ে দুটো আঁখির পাখি
আগল খুলে মনের খাঁচার

খুঁজছে ভোরে জোছনা যাচার
শিউলি-মাথা টকের আচার
লিখেই তাদের মুঠোয় দিলুম
আজব দাওয়াই হেসে বাঁচার

জেনেও মজা কেমন মানুষ লিয়ার
এমন যে বই লিখলো কাঁড়ি কাঁড়ি
কেউ বলে সে মানুষ সদয় হিয়ার
কেউ বা বলে পাগলা রাগী ভারি!

মনটা সরল হ'লেও তা খুঁতখুঁতে
নাকের বহর বাপ্‌রে বড় কতো
মুখের গড়ন কমবেশি কিন্তুতে
দাড়িটা তার পরচুলেরই মতো।

চোখ কান আছে দু'হাতে দশ আঙুল
বুড়ো আঙুল দুটো গোনার ফলে
ছিল গায়ক, এখন তো বিলকুল
ভিড়ে গেছে হাবা-বোবার দলে।

ছড়ার ছাঁদে নিজের ছবি

ঝকমকে এক বটুকখানায় বসে
দেয়াল-জোড়া নানান রকম বই
ইচ্ছে মতন চুমুক মারে রসে
ঝিমোয় না সে, করে না হই-চই।



বন্ধু অনেক জ্ঞানী, বাউণ্ডুলে
'বুড়ো ফস' সে ডাকে বেড়ালটাকে
শরীরটা গোল নাদুস-নুদুস ফুলে
বাটির মতন টুপিতে চুল ঢাকে।

হাঁটলে শাদা বর্ষাতিটা প'রে
ছেলেরা সব পেছন পেছন ধায়
চেঁচায় সবাই, 'পাগলা সাহেব ওরে
চলছে রাতের আলখাল্লা গায়!'

সাগর পারে কেঁদে সে হয় কাতর
পাহাড় চুড়োয় যায় চোখে জল নিয়ে
তাওয়ায় সেঁকা কেক কেনে আর আতর,
চকোলেট চায় কারখানাতে গিয়ে।

নেইকো রুচি আদার-পানা খাওয়ার
স্প্যানিশ পড়ে, বলতে পারে কি আর!
পাট চুকেছে এদেশ-সেদেশ যাওয়ার
আহা, জেনেও মজা কেমন মানুষ লিয়ার।

অনুবাদকীয়

শিশুদের মনোজগৎ অতি বিচিত্র। কল্পনার রঙিন তুলি বুলিয়ে তার উদার, উন্মুক্ত আকাশে নিত্য-নতুন আঁকিবুঁকি। আকাশ জুড়ে যেমন অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়, অথচ আয়তনে, উপাদানে, আলোক-বিচ্ছুরণে কারো সঙ্গেই কারো মিল নেই, তেমনি প্রতিটি শিশুর মনোজগৎও স্বতন্ত্র। কল্পনার রাজত্ব বলেই শিশুর মন তারার আলোর মতই দ্যুতিমান। তার নাগাল পেতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। কেউ যদি মনে করেন, কয়েকটি শিশুকে গল্প শুনিয়ে বা তাদের সঙ্গে দু' চারটে কথা বলেই শিশু-মনস্তত্ত্বে পারদর্শী হয়ে উঠেছেন, শিশুদের মনের কথা সব জেনে ফেলেছেন, তাহলে তাঁর মত মুর্খের স্বর্গে বোধ হয় কেউই বাস করেন না। জনৈক পাশ্চাত্য মনীষীর মতে:

'Every child born into the world is a new thought of God, an everfreshed and radiant possibility !'

সুতরাং আমাদের এই অনুবাদ শিশুদের কল্পনাপ্রবণ মনোজগতের কতখানি উপযোগী হয়েছে তার মূল্যায়ন প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে নয়, সেই অনন্যসুলভ হাসিমুখেদের কাছেই গচ্ছিত থাকুক, তারাই এর বিচার করুক।

লেখকের পক্ষে শিশু-সাহিত্য রচনার মালমশলা সংগ্রহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পন্থা হলো নিজের শৈশবের স্মৃতিসাগর মন্থন করা। সহজাত কারণে আমাদের দুজনের চিন্তাধারা ও কল্পনার মধ্যে ফারাক থাকলেও, আমরা দুজনেই আশৈশব খাপছাড়া ভাবনার বা আবোল-তাবোল রচনার অনুরাগী। সেই কারণেই লিয়ারের লেখা আমাদের আকর্ষণ করে এবং আমরা এর অনুবাদে আগ্রহী হই। ননসেন্স জাতীয় লেখার সোনার কাঠি শিশু-মনের ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগিয়ে দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে কুন্ঠা নেই যে ছোটদের মনের চৌহদ্দি চিরকাল এক থাকে না, থাকতে পারে না––মৃদুমন্দ গতি হলেও যুগের ধারার সঙ্গে তা পরিবর্তনশীল। কানে শোনা এবং চোখে দেখার ভিতের ওপরই গড়ে ওঠে কল্পনার অট্টালিকা। মানুষের চেতনার বাইরে যা তা নিয়ে সে কখনই কল্পনা করতে পারে না। আজকের শিশুরা বর্তমান জগৎকে দেখছে, অভিভাবকদের কাছে এই দুনিয়ার কথাই নানা ভাবে শুনছে। তাই তার কল্পনায় এ যুগের ছাপ পড়া খুবই স্বাভাবিক। অনেক প্রাগৈতিহাসিক জীবদের মত একদিন হয়তো দীর্ঘায়ু লিয়ারের আকর্ষণও শিশুদের কাছে লোপ পেয়ে যাবে, কিন্তু সে-সময় এখনও আসে নি। লিয়ারের লেখা ও রেখা আজও শিশুচিত্তে আনন্দের ঝড় বইয়ে দিতে সক্ষম।

লিয়ারের বিভিন্ন রচনার অবিকল ছবি সবক্ষেত্রে বাংলায় অনুবাদ করা শুধু দুরূহই নয়, অসম্ভবও বটে। তবু তার জলছবি তুলতে না পারলেও, বিষয়বস্তুর আদল বাংলায় আনা যেতে পারে, ইংরিজি রচনার নীল-লাল রঙে বাংলা ভাষার তুলি ডোবানো যেতে পারে, ইংরিজি ভাবকে বাংলায় বিচিত্রিত করা যেতে পারে। এই সব 'পারা যেতে পারে'র খেয়াকেই আমরা পারান্তর করার চেষ্টা করেছি।

লিয়ারকে কেউ কেউ লিওর বা লিয়র লিখে থাকেন। অভিধানে দেখেছি উচ্চারণ দেওয়া আছে লিয়ার। তিনি নিজেও তাঁর নামের সঙ্গে queer ও beer মিল করেছেন।

লিয়ারের রচনার মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে লিমেরিক। এই লিমেরিকই তাঁকে অমর করে রেখেছে। লিয়ার সাধারণত প্রথম লাইনের শেষ শব্দ দিয়ে শেষ লাইনেরও মিল করেছেন, কিন্তু অধুনা লিমেরিকে শেষ লাইনের মিলে নতুন শব্দ ব্যবহারের রেওয়াজ চালু হয়েছে।

লিয়ার অধিকাংশ সময় তাঁর লিমেরিক গ্রাম, শহর, বন্দর ইত্যাদির নাম দিয়ে শুরু করেছেন-- আমরা সেই জায়গার নাম কখনো বদল করেছি, কখনো করি নি, কখনো তা লিমেরিকের মধ্যে বা শেষে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছি। আবার কখনো বা অনুবাদের সুবিধের জন্যে তা একেবারেই বাতিল করে দিয়েছি। অনুবাদ আক্ষরিক না হলেও আসল বিষয়বস্তুকে আমরা সব সময়েই ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

Nonsense Cookery'র অনুবাদে আমাদের মূল রচনা থেকে বিশেষ সরে আসতে হয় নি, কেবল দু'চারটে ইংরিজি নামের বাংলা নামান্তর করেছি, কাজেই আমাদের পরিবেশন থেকে ওই রান্নার আজগুবি স্বাদ পেতে কোনই অসুবিধে হবে না।

লিয়ারের গল্প অনুবাদ করার সময় যত দূর সম্ভব মূল রচনাকে অনুসরণ করে সহজ বাংলায় তা প্রকাশের চেষ্টা করেছি। যেমন লিয়ার-সৃষ্ট আজব প্রাণী Quangle-wangle-কে আমরা বলেছি হাট্টিমা-টিম-টিম, Pobble-কে বলেছি হতুমথুমো। বলা বাহুল্য, এগুলি অনুবাদের স্বার্থেই করতে হয়েছে। গল্পটিকে এদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্যে শেষ দিকে আমরা সামান্য পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করেছি। ওই গল্পের শেষে আছে, যে-গণ্ডারের পিঠে চেপে ওদের অভিযান সাঙ্গ হয়েছিল, সে বুড়ো হয়ে যেতে তাকে মেরে ফেলে সেই চামড়া দিয়ে একটা নকল গণ্ডার তৈরির কথা, কিন্তু এটি আমাদের দেশের প্রচলিত রীতিমাফিক নয় বলেই আমরা শেষে গণ্ডারটিকে হত্যা করি নি। আমরা প্রিয়জনকে হত্যা করার কথা ঠিক চিন্তা করতে পারি না।

লিয়ারের আত্মপরিচিতিমূলক কবিতাটি যথাসম্ভব মূলানুগ করার চেষ্টা করেছি। উদাহরণ হিসাবে ইংরাজি রচনার কয়েকটি পংক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি, আমাদের বাংলা তর্জমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

How pleasant to know Mr. Lear !
　　Who has written such volumes of Stuff !
Some think him ill-tempered
　　But a few think him pleasant enough.
His mind is concrete and fastidious,
　　His nose is remarkably big ;
His visages is more or less hideous,
　　His beard it resembles a wig.

When he walks in a waterproof white,
The children run after him so !
Calling out, 'He's come out in his night-
Gown, that crazy old Englishman, Oh !'

* * *

He reads but he cannot speak Spanish,
He cannot abide ginger-beer ;
Ere the days of his pilgrimage vanish,
How pleasant to know Mr. Lear !

Twenty six Nonsense Rymes & Pictures অনুবাদ করতে ইংরিজি শব্দের বাংলা তর্জমা করে তার অনুপ্রাস ব্যবহার করেছি। যেমন, The Lively Learned Lobster who mended his own cloth with a niddle and thread আমাদের অনুবাদে দাঁড়িয়েছে, গভীর গর্তের গলদা চিংড়ি। অর্থাৎ Lobster-এর বাংলা গলদা চিংড়ি মাছের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনুপ্রাস।

বোটানিতে যেমন গাছ-গাছালির ল্যাটিন নামের শেষে ia, is প্রভৃতি যুক্ত হয়, লিয়ারও তেমনি তাঁর ননসেন্স বোটানিতে ia এবং is দিয়ে উদ্ভট উদ্ভট ইংরিজি শব্দের সৃষ্টি করেছেন। আমরাও ভাষান্তরে এই ধারা বজায় রেখেছি। যেমন লিয়ারের Smalltoothcombia Domestica হয়েছে ছোটো-দাঁড়াচিরুণীয়া গৃহস্থালীয়া।

ছোটরা বড় হয়ে এবং অনুসন্ধিৎসু বয়স্ক পাঠকেরা যদি আমাদের এই অনুবাদ পড়ে লিয়ারের মূল রচনা পাঠে আগ্রহী হন, তাহলে আমরা নিজেদের সত্যিই ধন্য মনে করবো। আর তখনই তুলনা-মূলকভাবে ধরা পড়বে আমাদের এই অনুবাদ কতটা রসোত্তীর্ণ, মূল উৎসের কতটা কাছাকাছি। নমুনা-স্বরূপ একটি মাত্র রচনার কিঞ্চিৎ এখানে উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। লিয়ার তাঁর বিখ্যাত 'Jumblies' কবিতায় লিখেছেন:

They sailed to the Western Sea, they did,
To a land all covered with trees,
And they bought an Owl, and a useful Cart,
And a pound of Rice, and a Cranberry Trat,
And a hive of silvery Bees.
And they bought a Pig, and some green Jackdaws,
And a lovely Monkey with lollipop paws,
And forty bottles of Ring-Bo-Ree,
And no end of Stilton Cheese.
Far and few, far and few,
Are the lands where the Jumblies live ;
Their heads are green, and their hands are blue,
And they went to sea in a Sieve.

সূচি



নাকের ডগায় পাখপাখালির বাসা
সারাটা দিন রোদ পোয়ানো খাশা!

লিয়ারের সকল স্বাদের সমস্ত বিশিষ্ট রচনাই আমরা এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করেছি। আবোল-তাবোল লেখার প্রায় সব ক'টি শাখাই লিয়ারের হাতে এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে। লিমেরিক, গল্প, কবিতা, অক্ষর পরিচয়, বৃক্ষ পরিচয়, রন্ধন শিক্ষা প্রভৃতির নানা উদ্ভট বর্ণনা চয়ন করেই গাঁথা হয়েছে 'যত সব ননসেন্স'। পরিচ্ছেদ ভাগের সময় আমরা নাম দিয়েছি আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম। লিমেরিক রেখেছি আগাডোমের ঘরে, বাগাডোমের ঘরে আছে উদ্ভট গল্প 'ছোট্ট সোনা চারজনা---', ঘোড়াডোম হচ্ছে দীর্ঘ কবিতাবলী ও গানের ঘর, পুরোনো কিন্তু ফুরোনো নয় এমন সব পরিচ্ছেদ রান্না থেকে কান্না হচ্ছে 'এবং', ক'গাছা আগাছা হলো 'তারপর' আর অক্ষর জানা হচ্ছে 'অবশেষে'। নানান তরো পিছলে-পড়া হাসির হররাকে বইবন্দী করতে যে পরিশ্রম করেছি, একমাত্র ক্ষুদে বাঙালী পাঠকের ঠোঁটের ফাঁকে হাসির ঝিলিক ফুটতে দেখলেই তা সার্থক হবে।

আরেকটি কথা, ছোটদের পত্রিকা 'ঝুমঝুমি' ও 'রোশনাই'-এর জন্যেই আমরা প্রথম অনুবাদগুলি করতে শুরু করেছিলাম। পরবর্তীকালে ওই দুটি পত্রিকা ছাড়াও পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা সাগ্রহে এর বেশ কয়েকটি প্রকাশ করেছেন। বার্ষিক 'আনন্দ মেলা'র জন্যে বড় গল্পটি লেখা হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তাগিদেই। এই সুযোগে এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

শেষে বললেও যাঁর কথা সর্বদাই মনে রয়েছে তিনি দিলীপ দে চৌধুরী, যিনি অনুবাদ থেকে শুরু করে গ্রন্থটির সৌষ্ঠব পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে অকুন্ঠিত সহায়তা করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের কৃতজ্ঞতা বা ধন্যবাদ জানানোর সম্পর্ক নয়।

কলকাতা
১২ মে ১৯৭৪

অশোককুমার মিত্র
শৈলশেখর মিত্র

প্রকাশকের কৈফিয়ৎ

যাহা অদ্ভুত, যাহা আজগুবি সেই উদ্ভুটির কারবারী এডওয়ার্ড লিয়ার। যেমন লিখেছেন কলমে—তারই প্রতিচ্ছায়া রূপ দিয়েছেন তুলিতে। কিচ্ছুটি যেন অসম্ভব নয় তাঁর ভাবরাজ্যে। এই মুহূর্তে এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী ছাপতে গিয়ে আমারও বার বার মনে হয়েছে অসম্ভব শব্দটিকে আমরাও যেন মুছে ফেলেছি আমাদের অভিধান থেকে। মানুষের সৃষ্ট একরাজ্যের বাধা আর বিপত্তির মধ্যে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত পেরিয়ে চলেছি আমরা। সেকথা নতুন করে বলার প্রয়োজন রাখে না আজ আর।

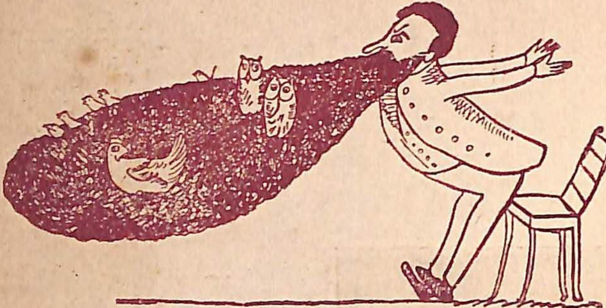
আঁধার শুধু আজ আর আমাদের চোখের ছোঁয়ায় নয়—আঁধার আজ মৌরসী পাট্টা জাঁকিয়ে বসেছে আমাদের চারপাশে। অক্টোপাশের মত সে আজ গিলতে চলেছে বাঙালীর দীর্ঘকালের গর্বের বস্তু বাংলা সাহিত্য জগৎকে। নেই আর নেই-এর অন্ধকার রাজ্যের হাজারো বাধা, হাজারো বিপদ পেরিয়ে—অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের গ্রন্থাবলী পরিকল্পনার তৃতীয় গ্রন্থ এডওয়ার্ড লিয়ার রচনাবলী প্রকাশ পেল।

যাঁদের সহযোগিতা না পেলে হয়তো বা এ বই-এর প্রকাশ দুরূহ হয়ে পড়ত—বন্ধুবর অশোককুমার মিত্র, শৈলশেখর মিত্র ও দিলীপ দে চৌধুরী—এঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সবশেষে এ বই-এর ভালমন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আমার পাঠক বন্ধুদের ওপর—তাদের ভাল লাগলেই সার্থক মনে করব আমাদের এই উদ্যোগ।

গীতা দত্ত

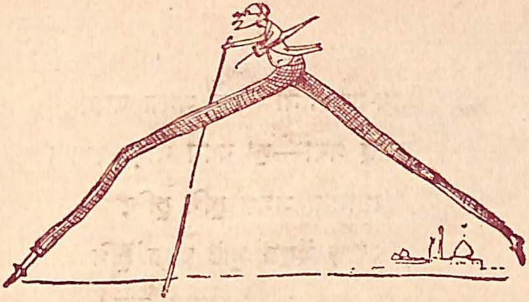
জুলাই ২১, ১৯৭৪



দেড়েলবুড়ো ব'লল মাথা নেড়ে,
'যা ভেবেছি তাই হয়েছে যে রে!
শালিখ প্যাঁচা মোরগ চিলে
বানিয়ে বাসা সবাই মিলে
দাড়ির ভেতর বাস করছে বেড়ে।'



মাদ্রাজে থাকে বড়ো---ভীষণ হাঁদা,
মাখন রঙের এক চাপলো গাধা
কান দেখে সে গাধার
উড়ে গেল প্রাণ তার
দু' চোখেতে লেগে গেল গোলক-ধাঁধা!



সিং বোঙাদের লম্বা মানুষ মস্ত বড় পা,
এক লাফে যায় ডিঙিয়ে শহর কেউ যা পারে না।
দিল্লী থেকে বরমা গিয়ে,
ফিরে এলো ঘর বানিয়ে
অবাক কাণ্ড, সময় নিল একটি লহমা !

সাগরতীরের বুড়ো গুটিগুটি
উঠে গিয়ে বসলো চেপে খুঁটি।
ঠাণ্ডা যখন নামলো তেড়ে,
বুড়ো এসে খুঁটি ছেড়ে
বললো, 'খাব গরম মাখন রুটি।'

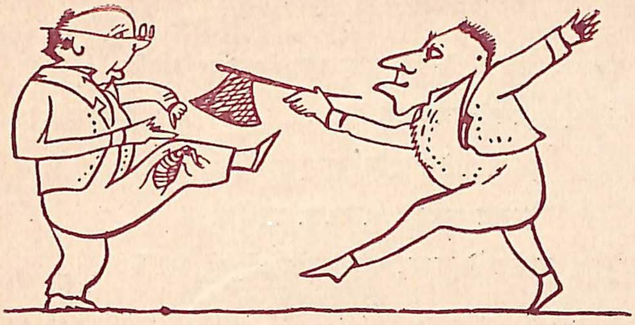




গোলগাল বুড়ো ছিল ভারি মজাদার,
খাপছাড়া ধরনের তারই ব্যবহার।
তেষ্টা না পেলেও সে
মারবে চুমুক ব'সে
'মোটা হবে', শুনে বলে, 'তাতে ক্ষতি কার?'

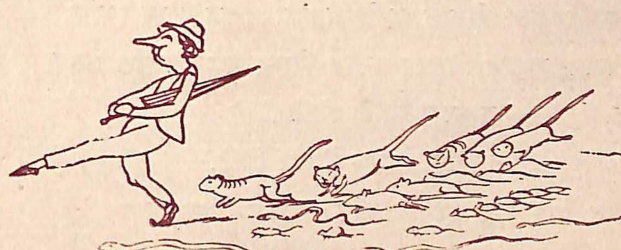
'ভাল্লাগে না ভিড়ের শহর গাছের মাথাই সেরা,'
এই ভেবে সে শহর ছেড়ে বাঁধলো গাছে ডেরা।
হঠাৎ সেথায় হাজার কাকে
ঠুকরে দিলো তারই টাকে;
মনের দুখে ঘটলো তখন ফের শহরে ফেরা।

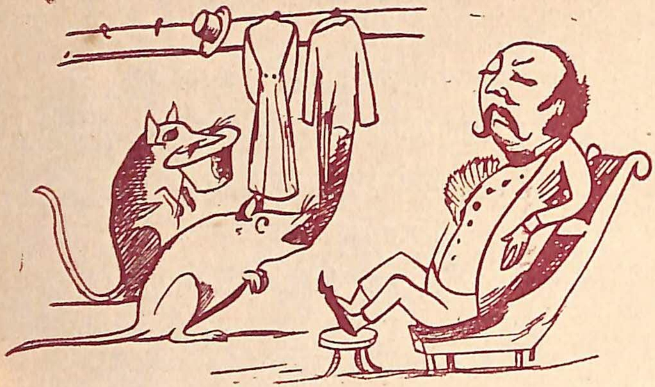




মাছিটাকে উঠলো বুড়ো ব'কে,
'মারবো এবার আছড়ে আমি তোকে!'
তাই না শুনে সবাই মিলে
কুড়ুল তাকে এগিয়ে দিলে;
অমনি বুড়ো উথলে ওঠে শোকে।

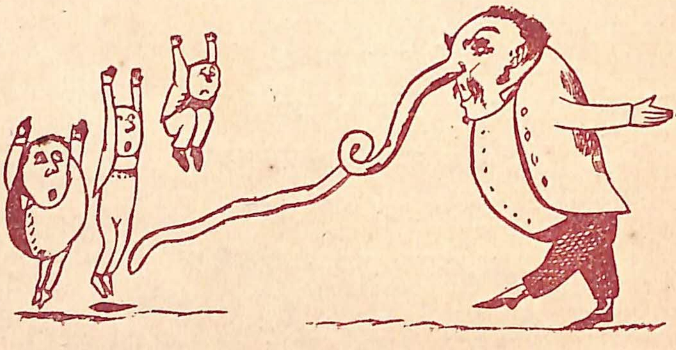
চললো বুড়ো ডিঙিয়ে পাহাড়, পেরিয়ে তেপান্তর,
ঘরের বাঁধন ছিন্ন করে চলছে অতঃপর।
সঙ্গী ইঁদুর নেংটি, ধেড়ে,
সাপের বাচ্চা গর্ত ছেড়ে
বেড়ালগুলো চলছে মিলে, বন্ধু পরস্পর।





আধ-ভেজানো হয়ত সদর দ্বার,
চলছে গবা—দু' কান খাড়া তার।
ঢোলার সময় চুপি চুপি,
খেড়ে ইঁদুর স্যুট আর টুপি
খেয়ে-দেয়ে হলো পগার পার।

নাকের মালিক ওই দেখো ওই লোকটাকে,
'মস্ত বড় নাক' ব'লে কেউ যেই ডাকে।
নাক দেখিয়ে লোকটি বলে,
'মস্ত নাক কি বলা চলে ?
ভালো ক'রে লক্ষ্য করো এই এটাকে।'



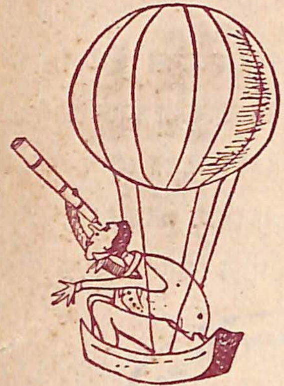


মেমসাহেবের বোনের ছিল দীঘায় বাড়ি,
নাবিক হয়ে ভাবলো দেবে সাগর পাড়ি।
দূরবীণেতে সাগর দেখে
ব'ললো হেসে গাছের থেকে,
'নড়বো নাকো কোথাও আমি দীঘা ছাড়ি।'

নরম টুপি মাথায় বেঁধে যেই বেরুলো মেয়ে,
নানান পাখি সেদিক পানে আসলো হঠাৎ ধেয়ে!
টুপির বাঁধন ফর্দাফাঁই,
ব'ললে মেয়ে, 'এটাই চাই,
আকাশ ছেড়ে আসুক ওরা টুপির বাসা পেয়ে।'



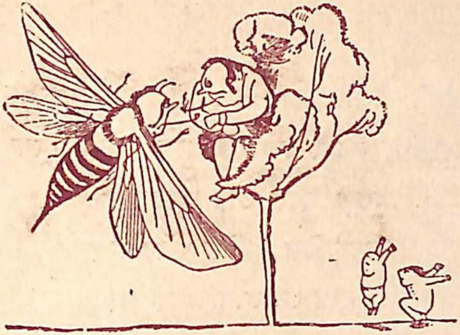




বুড়োর বাড়ি এক্কেবারে দেহাত,
মাথাতে তার বুদ্ধিটা কম নেহাত!
তাই সে গেলো বেলুন চড়ে
চাঁদমামাকে আনতে ধরে;
চাঁদমামা তো হলো তবু বেহাত।



বাড়ি তার জ্যামাইকা লোকটা কালো,
আনলো সে মেম-বৌ দেখতে ভালো।
'ওরে ভুশুণ্ডি কাক
থাক তুই, একা থাক'
এই ব'লে বৌ তাকে ফেলে পালালো।



তরু-চুড়োয় আপনারে সে ক'রেছিল ন্যস্ত,
এমন সময় মৌমাছি তায় করলো যে উদ্ব্যস্ত ;
শুধায় লোকে, 'গুনগুনিয়ে
যাচ্ছে কি মৌ গান শুনিয়ে ?'
ব'ললে সে, 'হুঁ, গান শুধু নয়, তার চে' জবরদস্ত !'

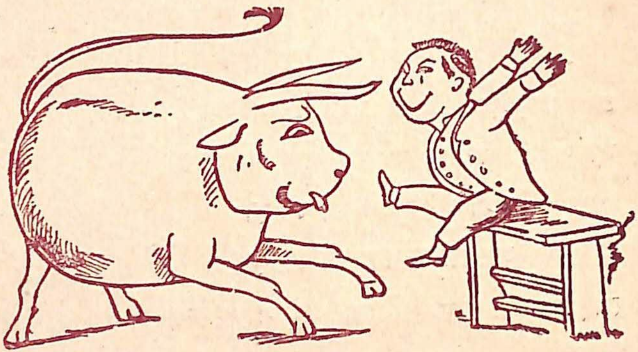
আজব দেশের সে এক বুড়ো-খোকা
চলন-বলন কেমন বোকা-বোকা !
সিঁড়ির ওপর ব'সে ব'সে
নাশপাতি আর আপেল চোষে,
বে-আক্কেলে লোকটা সে একরোখা।

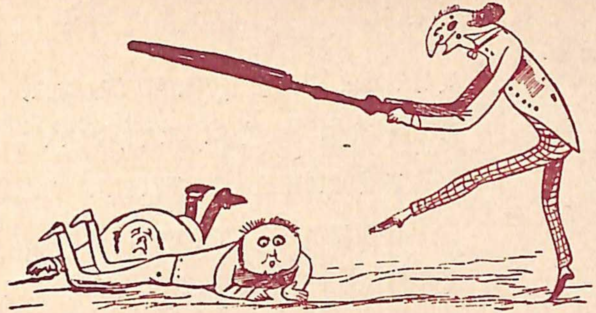




বললো বুড়ো, 'মিছেই দড়ি ছাড়ছি এবং ধরছি,
শুনছে না কেউ ডাক যে আমার, চেষ্টা এতোই করছি।
দিনরাত্তির হয়ে ব্যাকুল
ঘন্টা নেড়েই পাকলো যে চুল
দিচ্ছে না কেউ সাড়া, শুধু ঘন্টা টেনেই মরছি।'

কেমন করে বাঁচতে পারি পাগলা গরুর রোষ থেকে,
শিঙের ফলায় নিজের শরীর দিচ্ছে বলো চষতে কে?
হাসবো নাকি মিঠি-মিঠি
চাইবো এমন উদাস দিঠি,
ভ্রান্ত গরু শান্ত হবে রাখবে আমার দোষ ঢেকে!





বুড়ো পথে পথে ঘোরে হাতে ইয়া ডাণ্ডা
লাল রঙ মুখে মাখা, বেয়াকুফ পাণ্ডা।
কেউ বলে, 'উজবুক
রঙ মেখে কিবা সুখ !'
উত্তর মুখে নেই ডাণ্ডায় ঠাণ্ডা !



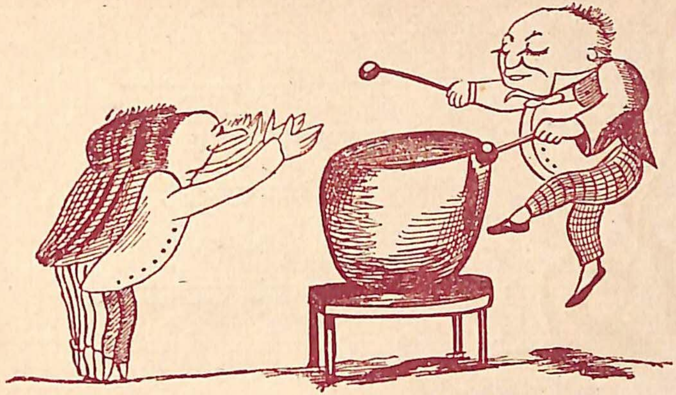
সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো বনগাঁয়
ঘুরতো-ফিরতো হেথায়-সেথায় রণ-পায়।
গোলাপ, গাঁদা, গন্ধরাজে
রণ-পা'টা তার আজব সাজে
সাজিয়ে নিতো যেমন খুশি মন চায়।



বাঁশি বাজায় লোকটা দেখি পরম সুখে,
কোত্থেকে এক কেউটে এসে পড়লো ঢুকে
সুড়ুৎ করে তার জুতোয়;
দিনরাত্তির বাঁশির গুঁতোয়
সাপ পালালো সে দেশ ছেড়ে মনের দুখে।

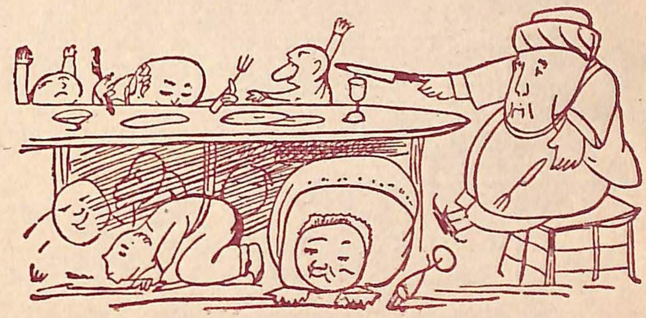
ভালো যারা বাসে তারা এলো না কাছে,
তাইতো একলা মেয়ে চেপেই গাছে
'তাইরে নাইরে' স্বরে
বাপরে কি গান ধরে,
ভালো যারা বাসে তারা পালিয়ে বাঁচে!

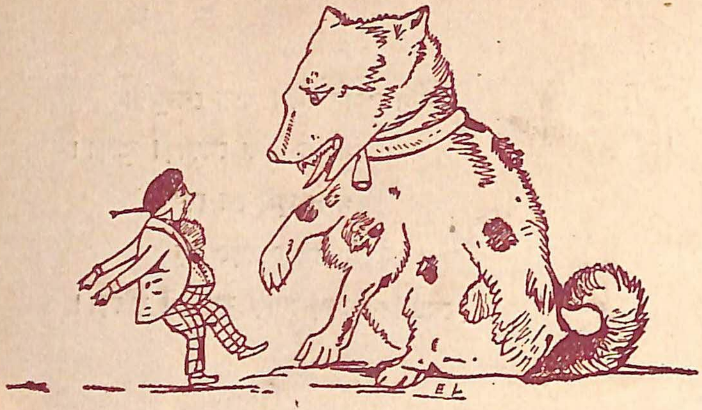




দমাদম সারাদিন ধরে বেসুরো
দামামা পেটায় এক বেয়াড়া বুড়ো।
‘উৎপাত তুই যে রে’
ব’লে সব তেড়েমেড়ে
বেচারার হাড়-গোড় করলো গুঁড়ো!

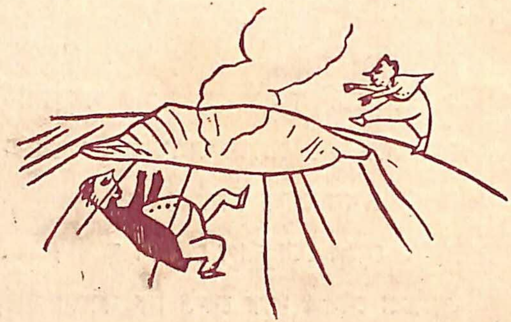
সাজিয়ে টেবিল হাল-ফ্যাসানের মাড়োয়ারী
ছেলেদের তার ভোজ খাওয়ালেন বারোয়ারী।
এমন গেলা গিললো তারা
দেখে তো বাপ গেলেন মারা;
এ্যায়সা বেদম খায় কেউ কি কারো বাড়ি!





যাচ্ছে বামন রামগড়েতে,
কুকুরছানা এক চড়েতে
আটকে তাকে,
কী হাঁকডাকে
পুরলো পেটে তারপরেতে !

আগ্নেয়গিরি থেকে বাপ রে
বুড়ো দিলো জ্বালামুখে ঝাঁপ রে !
'গরম কি লাগে ভাই ?'
তাকে শুধালো সবাই
গুলবাজ বলে, 'নেই তাপ রে' !

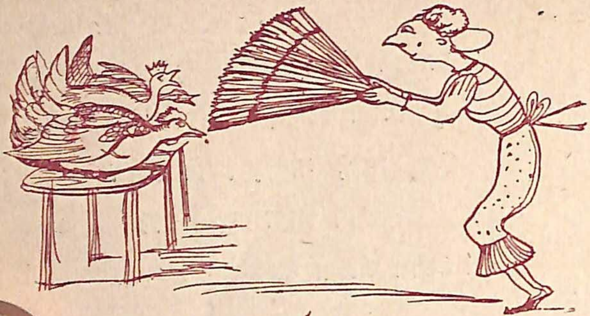




পেরুর মানুষ এখন-তখন করবে কি সে?
ভেবে ভেবেই বুদ্ধি হারায় পায় না দিশে।
ভালুক ভেবে গর্জে উঠে,
হঠাৎ আবার কি উদ্ভুটে
নিজের চুলই ছিঁড়ল বেবাক এক নিমিষে।

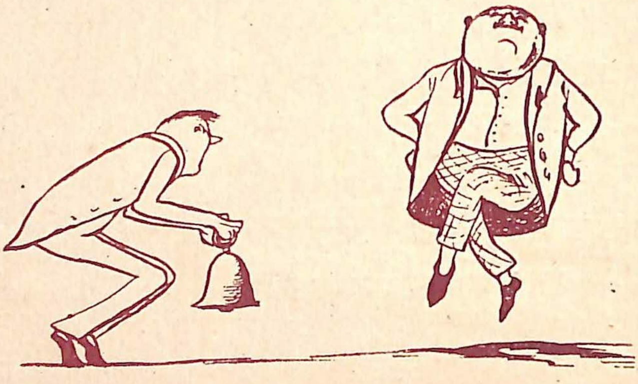
হাত-পা ছুঁড়ে ব'ললে বুড়ো, 'হাসছি আমি,
কারণ ডিঙায় ভাসছি আমি, ভাসছি আমি;'
ব'ললে সবাই, 'মোটেই না তা'
শুনেই বুড়োর ঘুরলো মাথা,
'কপাল ফুটো, ডুবতে ডুবতে টাঁসছি আমি।'





বাজার থেকে মুরগী কিনে সঙ্গে নিলো পাখা
এই গরমে চাই তো ওদের ঠাণ্ডা করে রাখা!
টুলের ওপর বসিয়ে রেখে
দিচ্ছে হাওয়া থেকে থেকে
তিন মুরগীই খাচ্ছে হাওয়া, বন্ধ এখন ডাকা।

বুড়োর অনেক সাঙ্গপাঙ্গ জুটলো
মুখে মুখে সুনাম তো তার ছুটলো!
ঘন্টা শোনার সাথে সাথেই
নাচলো সে যেই তা থেই তা থেই
আনন্দে সব ডগমগিয়ে উঠলো।





সুন্দরী ললনা চলে হাঁটি হাঁটি
সুদীর্ঘ নাসিকাটি ছুঁয়ে যায় মাটি !
তাই মেয়ে ভাড়া করে
মাটি থেকে তুলে ধরে
ঘাড়ে বয়, রাখে নাক অতি পরিপাটি !



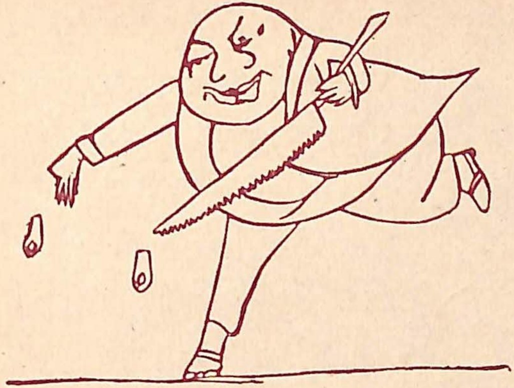
দাড়িয়ান বুড়ো বসে ঘোড়ার পিঠে
ঘোড়া তো লাফিয়ে ওঠে এক মিনিটে !
বলে সবে, 'আরে আরে,
পড়ে যাবে কার ঘাড়ে !
তুমি বুড়ো দাড়িয়াল, লোকটি মিঠে !'



ইয়া বড় টিকি তার, কেন জানি না
কষ্টে-সৃষ্টে থাকা করে সে ঘৃণা।
আরামে চেয়ারে দোলে
শূন্যে পা দুটি তোলে,
আয়েসী বেতাল বুড়ো কারণ বিনা!

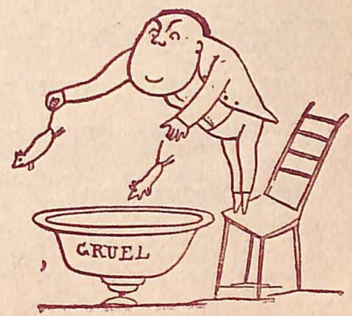
বুড়োর ছিল বিশ্রী জুতো
তৈরি কিসে কেই বা জানে!
ক্যাঁচোর-কোঁচর উঠত আওয়াজ
হাঁটলে পরে ওদিক পানে।
চামড়া দিয়ে তৈরি নাকি?
মুচির-পো কি দিচ্ছে ফাঁকি?
শুধালে পর এসব কথা
কখ্‌খনো সে নেয় না কানে।

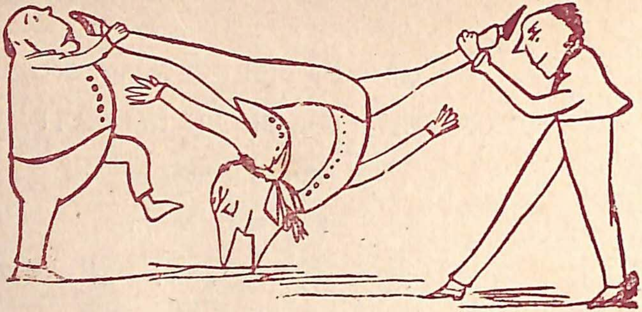




যেমন বুড়ো তেমনি টেকো আজগুবি লোক,
ব'সে ব'সে ঘ'ষে ঘ'ষে উকোতে নখ
কাটলো দুটো বুড়ো আঙুল ;
ব'ললো, 'এতে নেই কোন ভুল
নখ ঘ'ষলেই কাটবে আঙুল গোটা কতক।'

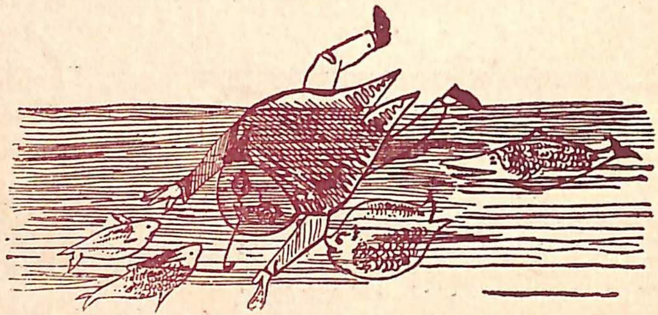
সেই যে বুড়ো কাটাতো দিন আয়েসে,
ভোজন-পর্ব ক'রতো সারা পায়েসে।
আনতে সোয়াদ পায়েসটাতে
ছাড়লো দুটো ইঁদুর তাতে,
তাই খেয়ে তো তাগড়া হলো গায়ে সে।





ব্যস্ত সদাই ব্যস্তবাগীশ সামন্ত
কাজের চাপে একটুও নন থামন্ত।
থুঁত্‌নি এবং নাকের গোড়ায়
সবাই চেপে তাকে ঘোরায়
ঘুরে ঘুরেই সামন্ত তো ঘামন্ত!

বুড়ার রে ভাই ম্যালে না আর নমুনা
অবসরে সে দ্যাখতো ডুইব্যা যমুনা!
দ্যাখন সারা হ'লো যহন
ডুইব্যা মারা গ্যাছে তহন
হতভাগার কথা রে আর কমু না।





খামখেয়ালী স্বভাব ছিলো নারানদার
দেখতে গিয়ে ভাঙ্গাচোরা নালান্দার
তালগাছে এক ব'সলো চাপি
মত্ত হাওয়ার দাপাদাপি
ঠাণ্ডা হ'লে হদিশ মেলে বারান্দার।

দুই হাতে দুই ঝুলিয়ে শূয়োর ছানা
এই শহরে যে দিয়েছে হানা
হয় সে বুনো, নয় সে মাতাল
কিংবা পাজি বিকট দাঁতাল
ব্যস্ত ভয়ে সেপাই, পুলিশ থানা।



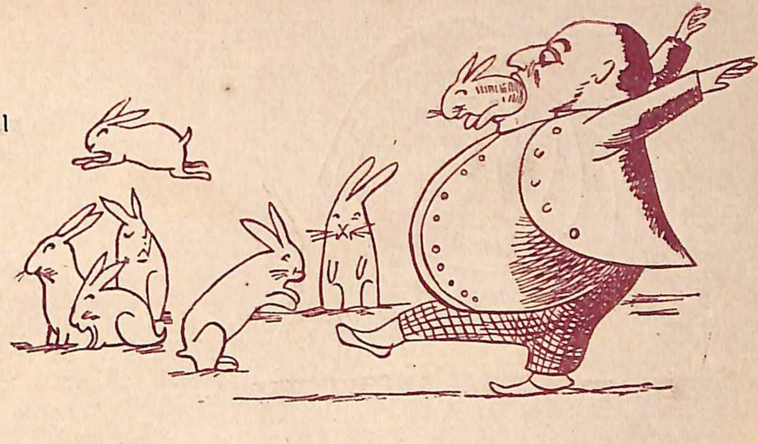


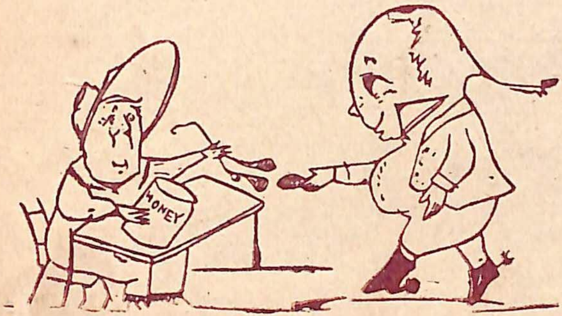
মজাদার লোকটা সে ভারি খেয়ালী,
বোঝা ভার অদ্ভুত তারই হেঁয়ালী।
কিনে সে আরবী ঘোড়া
দেখালো কদলী জোড়া
পার হলো শহরের সব দেয়াল-ই !

চাঁটগেঁয়ে বুড়ো ছিল অতি উদ্ধত,
'ভালো হয়ে চলো', লোকে ব'লেছিলো কত ;
বেড়ে যেতে যেতে যেতে
সক্কলে চটে এতে
হাতুড়ির ঘায়ে করে পরলোকগত।

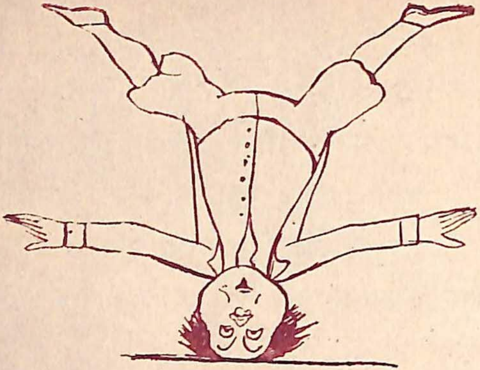


সবই ভালো শুধু এক বিচ্ছিরি দোষ
গিলে গিলে খেতো সে তো পুরো খরগোশ।
আঠারোর ধাক্কায়
প্রাণ বুঝি যায়-যায় ;
অভ্যাস ছেড়ে শেষে ভারি সন্তোষ!



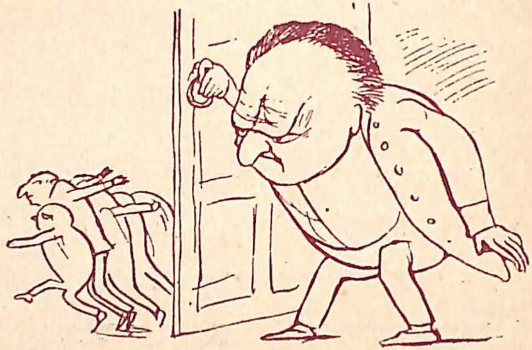


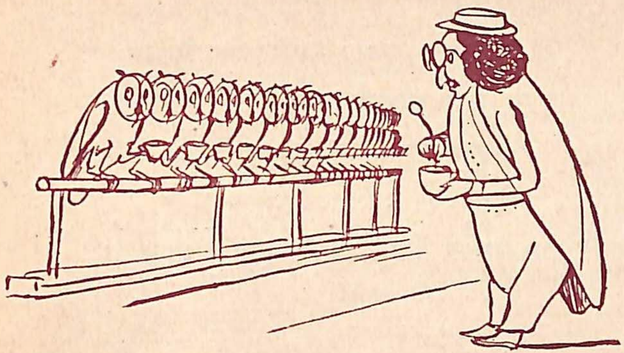
গোয়ালন্দের এই লোকটার ব্যাপার-স্যাপার দেখো দিকি,
রয় না হাতে কখ্‌খনো তার আধলা বেশি একটি সিকি!
সেই পয়সায় কিনবে পেঁয়াজ
এবং মধু, এটাই রে'য়াজ
ফিরবে ঘরে খোশখেয়ালে গান গেয়ে আর দুলিয়ে টিকি।



সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো রাজস্থান
চলায়-বলায় প্রমাণ করতো শক্তিমান।
যতোক্ষণ না ভিজলো বসন
রইলো ক'রে শীর্ষ আসন
অদ্ভুতুড়ে বুড়োর এ কি কঠিন জান!

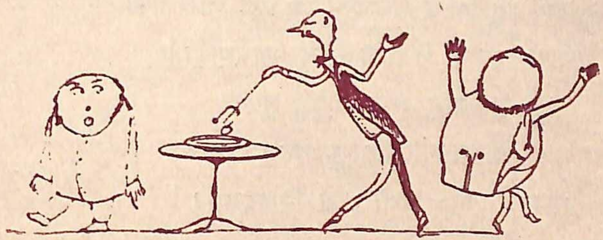
বেরিলী শহরবাসী, মেজাজটা ভারী
মুখখানা গম্ভীর যেন তোলো-হাঁড়ি!
দোর খোলে মিনিট কি বেশি
টের পেতো তাও প্রতিবেশী
দৌড়ে পালাতো তারা সে শহর ছাড়ি!





জড়ো ক'রে এনে বুড়ো প্যাঁচাদের ছা
বলে, 'দেখো এই ভাবে খাবে রোজ চা।
অখাদ্য ইঁদুর ধ'রে
কেন খাও সাধ ক'রে
চায়ের মতন স্বাদ মোটে পাবে না!

যেমনি রোগা লোকটি রে ভাই তেমনি তাঁরই খাদ্য
কড়াইশুটি, এককুচি সিম রোজ প্রতি বরাদ্দ!
তাতেই বলেন, 'আরেব্বাস
আর খাবো কি, সর্বনাশ
খেলেই জেনো গত্তি লেগে মুটিয়ে যেতে বাধ্য!'





হতাশ হয়ে ব'ললো বুড়ো, 'শুনছো সবে,
ভাবছি আমি জন্মাই নি আজও ভবে!'
সেই ভাবনায়, সে আফশোসে
চেয়ারেতেই ব'সে ব'সে
তুললো পটল কাঁদতে কাঁদতে, হায় কি হবে!

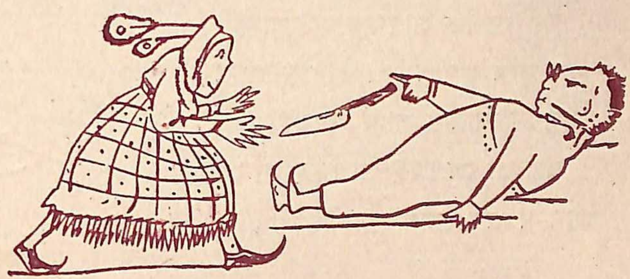
যেমনি সরল তেমনি বোকা মেমবুড়ি
কোনোখানে ছিলো নাকো তার জুড়ি।
কাঁটার ঝোঁপের সিংহাসনে
ব'সল গিয়ে আপন মনে
ছিঁড়ল জামা, লাগলো কাঁটার সুড়সুড়ি।

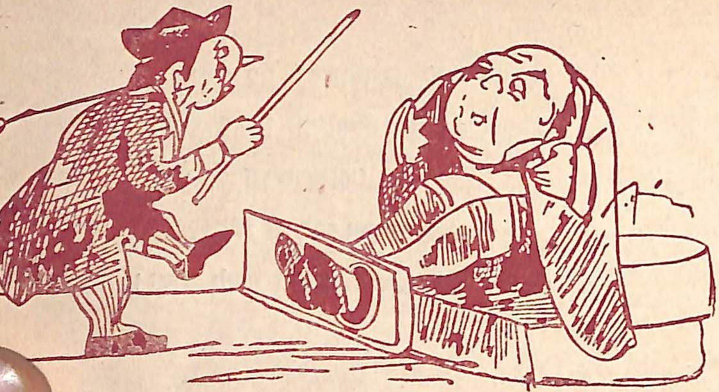




আনলো কিনে বুড়োটা ভাই মাসাঞ্জোরে
মুখ-ধোয়া জল ছ'টা পিপের মধ্যে ভ'রে।
বলে, 'পাহাড় থেকে ঠেলে
এসব আমি দেবো ফেলে
গভীর জলের মাছগুলোকে লক্ষ্য ক'রে।'

নিজেই নিজের গলার নলি কেটে তার
ধমকে ওঠে বৌকে বুড়ো বারম্বার!
বৌ তো কাঁদে অতঃপর
'হায় রে আমার প্রাণেশ্বর,
তোর মরণে করবে যে দেশ হাহাকার!'

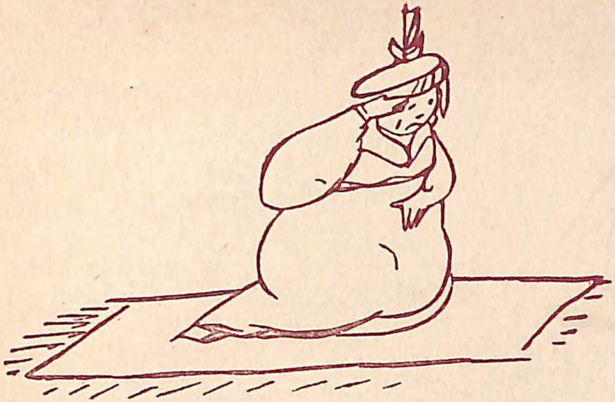




কেষ্টদহের বিষ্টুপদর জেল-পালানো মামা
গির্জে থেকে শুয়োর ছানা, পরচুল ও জামা
চুরির দায়ে পড়লো ধরা ;
সেপাই সাহেব বেজায় কড়া
কাঠের ফাঁদে বন্দী ক'রে ব'ললে, 'টানো হামা।'

হাঁসখালিতে মাঠের ধারে হাঁস ছিলো
হাঁসের সঙ্গে রসিক বুড়ো আসছিলো !
সব ঋতুতেই কৌতূহলে
যে যায় হেসে হাঁসের দলে
হাঁসখালিতে হাঁসের হাসি হাসছিলো !

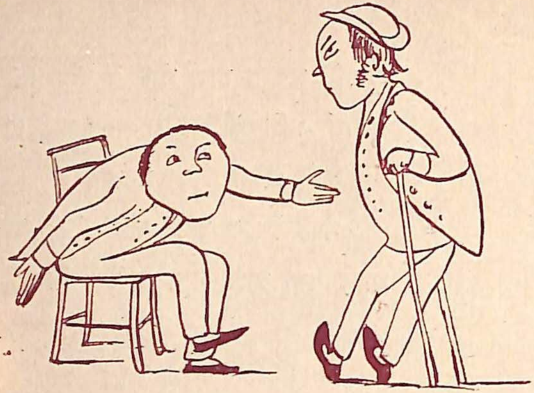




সেই যে মেয়ে বাস ছিলো যার টাকি
বাদলা দিনে কাঁদার কারণ তার কি !
যেই করে দিন আলোতে সাজ
অমনি মেয়ের শান্ত মেজাজ
খামখেয়ালীর খেয়ালেতে কার কি !

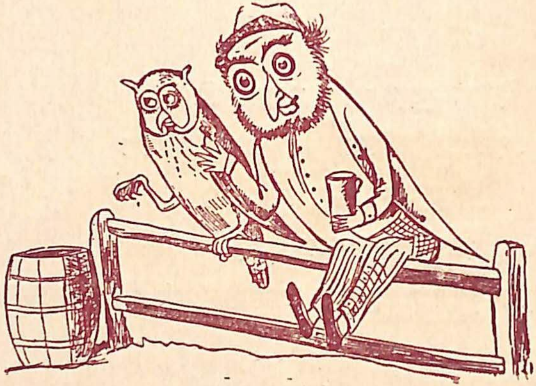
চোখ জোড়া মেয়েটার দেখবার মত
চোখে রং পাল্‌টায়, আকারও সতত !
যখনি সে চোখ মেলে
অমনি সকলি ফেলে
দৌড়ে পালায় লোকে বিস্ময়াহত !





খুলনার লোকটার সুখে দিন কাটতো
গোড়ালিতে ভর দিয়ে দিন-ভোর হাঁটতো।
যখন শুধায় কেউ, 'হাঁটো কেন,
কাজ নেই অকারণ খাটো কেন?'
উত্তর না দিয়ে সে শুধু ঠোঁট চাটতো।

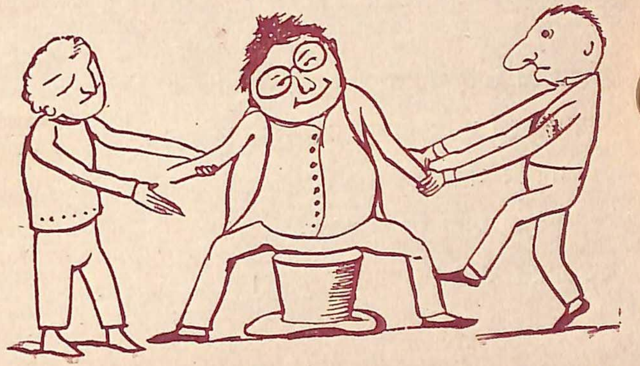
ওই বুড়োটা থাকতো পেঁচা নিয়ে
কানের মাথা খেতো সে চিল্লিয়ে!
সাঁকোর 'পরে ব'সে
দুজন মিলে ক'ষে
মন রাঙাতো বিশ্রী পানা দিয়ে।

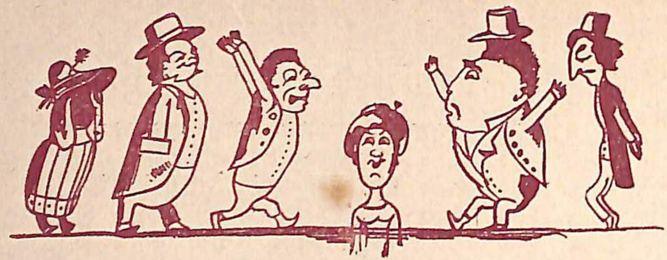




লোকটাকে দেখা গেল স্টেশনেতে এসে
শব্দের ফোয়ারায় যায় যেন ভেসে।
শুনে ওরা নস্যি
দিয়ে কয়, 'অবশ্যি
অনেক ব'কেছো, থামো! মরে যাবে শেষে!'

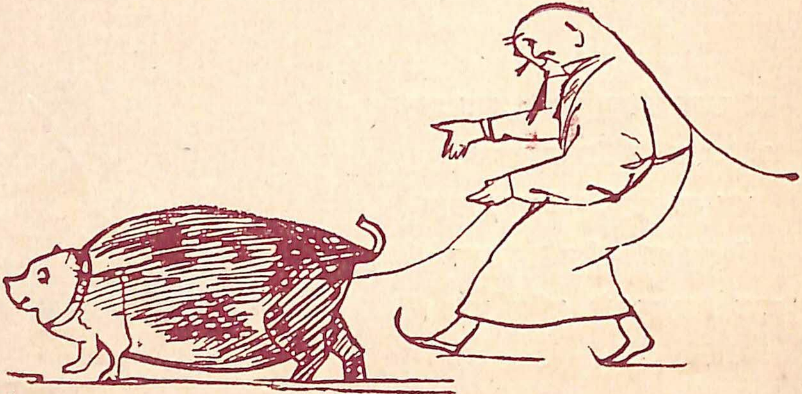
সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো আসানসোলে
'আনো যা হোক, ব'সবো আমি,' উঠলো ব'লে।
সবাই তখন টুপি নিয়ে
ব'লল, 'ওটায় ব'সো গিয়ে,
আসানসোলের হতুমবুড়ো তুমিই হ'লে।'

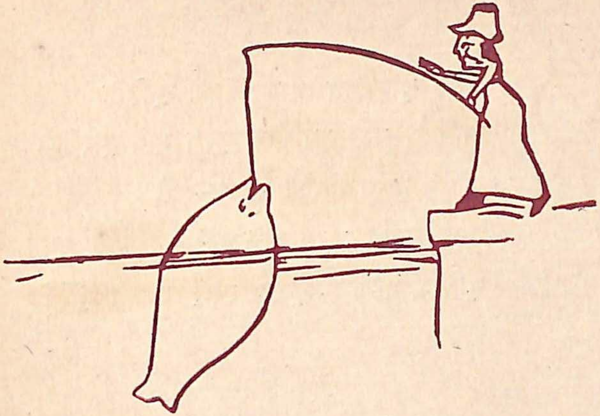




থাকতো বুড়িটা ভাই দূর লণ্ডন
নুয়ে নুয়ে করতো সে খালি বন্দন।
সারাদিন ঘুরে ঘুরে
চ'লে গেল মাটি ফুঁড়ে
ব্যথা পেয়ে জনগণ জোড়ে ক্রন্দন।

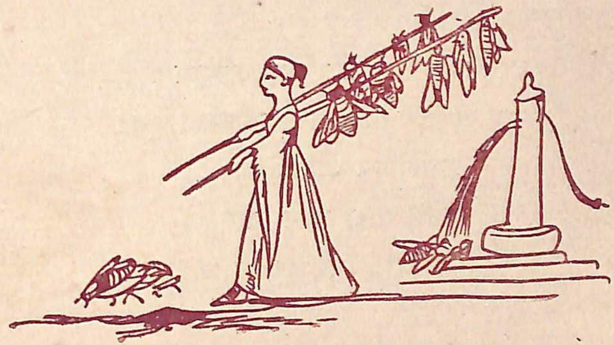
‘ভুলো আমার সবার চেয়ে মোটা,’
ব'ললো বুড়ো, ‘কেউ দিও না খোঁটা।’
থপাস্ থপাস্ চ'ললে ভুলো
দেশের মোটা কুকুরগুলো
দেখে বলে, ‘সেরা কুকুর ওটা।’





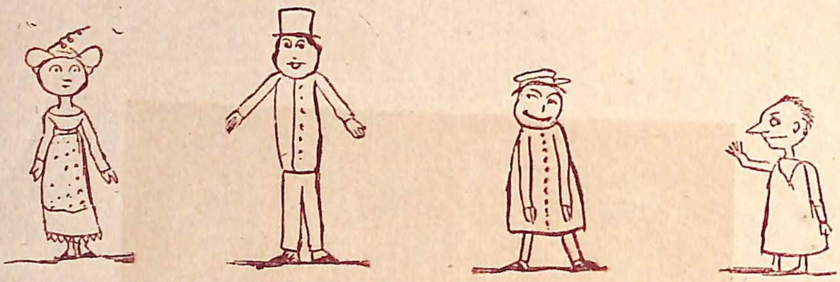
জেলের মেয়ে আঁশ ছাড়া এক মাছ ধ'রেছে মস্ত
যেমনি সে মাছ লম্বা, আহা তেমনি তারই প্রস্থ!
বঁড়শিতে টান দিতেই যে হায়
ব'ললে মেয়ে চাপড়ে মাথায়,
'দেখা দিয়েই মাছ পালালো জলের নিচে ত্রস্ত!'

এই মেয়েটির চোখের বালি মাছি
মাছির জ্বালায় কেমন ক'রে বাঁচি!
মাছি মেরে হাতের তলে
কিছু ডোবায় কলের জলে
ঝুলিয়ে মাছি নিয়ে সে যায় রাঁচি।



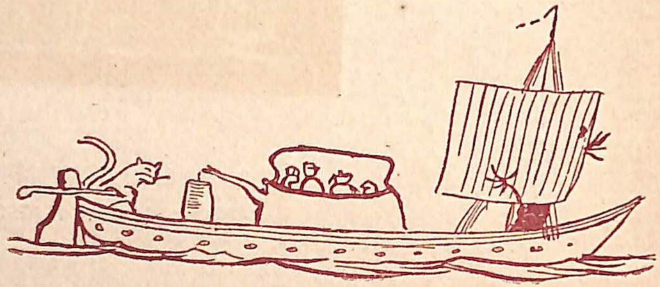
সে কি আজকের কথা নাকি! দেখতে দেখতে কতোদিন হয়ে গেল।

সেই আদ্যিকালে এক দেশে থাকত তিন ভাই আর এক বোন। তাদের নাম--



বেগুনি হাতুড়ি-পেটা খড়ের-সং আর সিংহের-পো

যেমনি তাদের নামের বাহার, তেমনি বুদ্ধির বহর। চার মুণ্ডু এক করে একদিন তারা ঠিক করল, পৃথিবী ঘুরতে বেরুবে। সামনের সমুদ্দুর থেকে রওনা হয়ে সারা দুনিয়া পাক দিয়ে দেশের পেছনের সমুদ্দুরে এসে হাজির হবে।

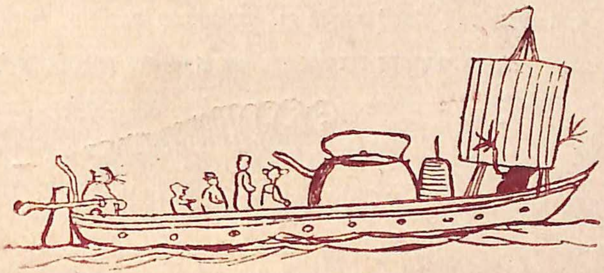


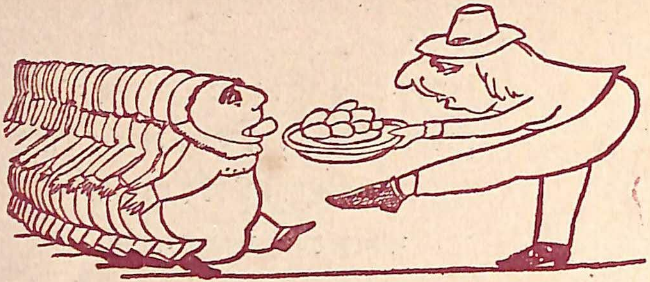
যেই-না ভাবা অমনি শুরু হল তোড়জোড়। বিরাট একটা পালতোলা নৌকো কিনে ফেলল। তার সর্বাঙ্গে লাগাল নীল রং আর মাঝে মাঝে সবুজ রংয়ের বুটি।

পালখানাকে করল হলদে-লালে ডোরাকাটা। এই যাত্রায় সঙ্গী নিল ওরা আরও দুজনকে। একজন হল পুষি বেড়াল--সে ওদের নৌকোর হাল ধরবে, নৌকোটাকে দেখাশোনা করবে; অন্যজন বুড়ো হাট্টিমা-টিম-টিম-- খাবার-দাবার রান্না করবে, চা-জলখাবারের ব্যবস্থা দেখবে। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা কেটলিও তোলা হল নৌকোয়।



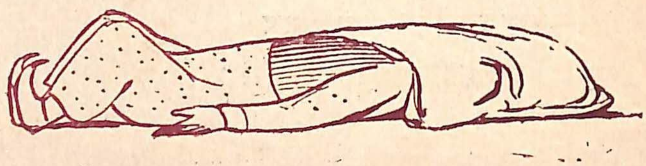
প্রথম দশটা দিন তাদের তোফা আরামে কেটে গেল। সমুদ্দুরে কিলবিল করছে অজস্র মাছ। লম্বা চামচে করে তুলে দেওয়ামাত্র হাট্টিমা-টিম-টিম সুন্দর করে রেঁধে দিচ্ছিল। পুষি বেড়াল তো সেই মাছের এঁটোকাঁটা খেয়েই খুশিতে ডগমগ। মনের আনন্দে ওরা ভাসতে ভাসতে চলেছে।

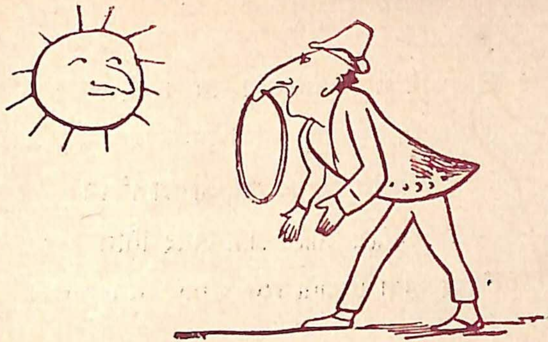




উদ্ভট বুড়োটার ছেলে ছিলো কুড়িটা
আরামে কাটাতো দিন তুলে হাই-তুড়িটা।
বুড়ো দিতো শুকো-রুটি
তাই খেতে হুটোপুটি
খুশিতে হাসতো বুড়ো, বেড়ে যেতো ভুঁড়িটা।

হংকং-এ বাড়ি য়ার কভু একচুল
কখনো করে নি সে তো কোনরূপ ভুল!
সারা'খন তাই ভুঁয়ে
চটে মাথা ঢেকে শুয়ে
জীবন কাটালে, নেই ভুলের মাশুল!

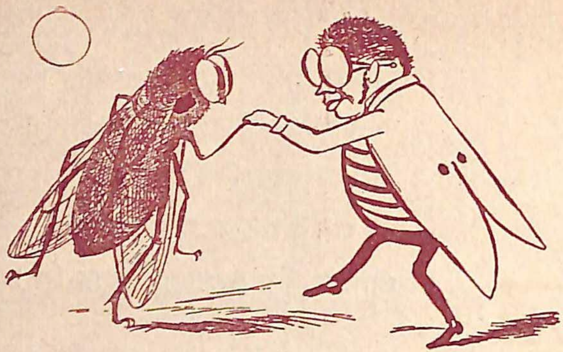




স্বনামধন্য চণ্ডীদাসের খুড়ো
নোলক দিয়ে সাজিয়ে নাকের চুড়ো
আষাঢ় মাসের সন্ধ্যে থেকে
চাঁদের দিকে দু' চোখ রেখে
আপন মনেই হেসে খুন হায় বুড়ো।

পুড়িয়ে মারার ভয় দেখাতে ঠানদি তারে
নাত্নি তো তাই বেড়াল ধ'রে বললো, 'আরে
এই বেটাকেই পুড়িয়ে মারো,
কারণ ঠানদি তুমিই পারো
চাপিয়ে দিতে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে!'

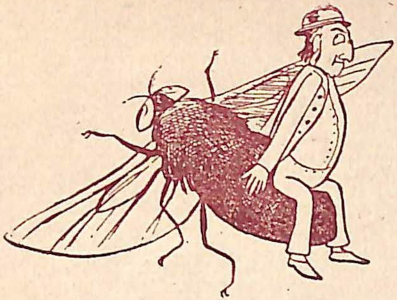




সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো তোপচাঁচি
নাচের সঙ্গী করতো যে নীল মৌমাছি !
চাঁদের আলোয় রাত-দুপুরে
গুনগুনিয়ে মিষ্টি সুরে
মন মাতিয়ে ব'লতো তারা, 'আয় নাচি !'



ওস্তাদ মেছুনি সে মাছ ধরে রুই
বঁড়শির আংটায় ওঠে এক দুই।
খাল বিল ভ'রে যায়
হাতে খিল ধরে যায়
ওস্তাদ ভাবে, মাছ কোথা আর থুই !

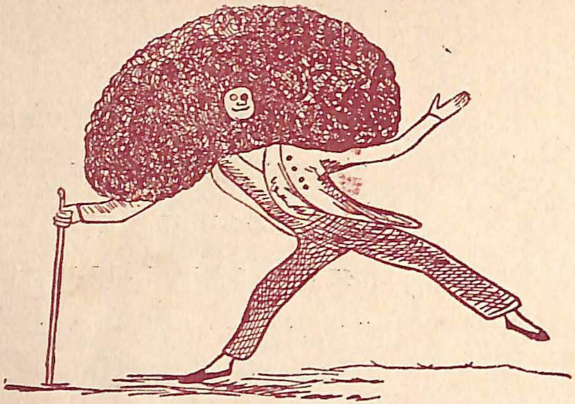


গাঁয়ের মানুষ, কি কারণে তাড়াতাড়ি
মাছির পিঠে চেপেই দিলো শহর পাড়ি!
শহরবাসী ব'ললো দেখে,
'কেশোনাকো, পিঠের থেকে
প'ড়বে খ'সে, প্রাণটা যাবে খাঁচা ছাড়ি!



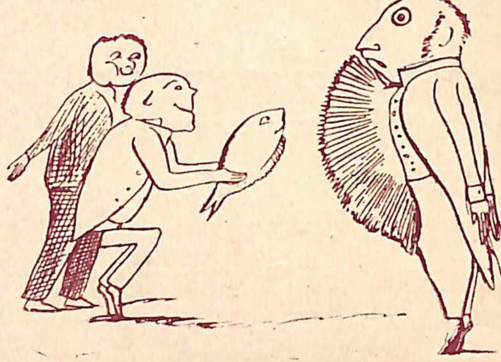
রূপোয় বাঁধানো ছিলো তার প্রিয় বাঁশি
নেচে নেচে বাজাতো সে উঠোনেতে আসি।
খুড়োদের শাদা শোর
শ্রোতা ছিলো যতো ওর
এমন মজার মেয়ে বাড়ি যার কাশী।





আজগুবি নয়, আজগুবি নয় বলছি সবই সত্যি
এই লোকটির মুণ্ডু ছিলো নেহাতই একরত্তি !
বাজার থেকে পরচুলা সে কিনে
বাগিয়ে লাঠি রাত্রি এবং দিনে
দিচ্ছে হানা চারদিকেতে ভীষণ যেন দত্যি !

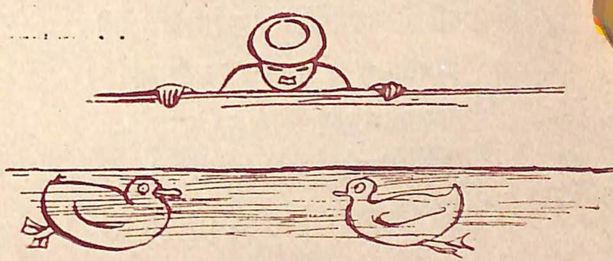
বিদঘুটে এক কিনলো পোশাক ঝালরওলা
চোখ দুটোকে করলো যেন আলোর গোলা
কেউকেটা ভাব আনলো ডেকে !
কিন্তু সবাই বললো দেখে,
'মাছের মত সাজলে কেন ভালোর-পোলা ?'

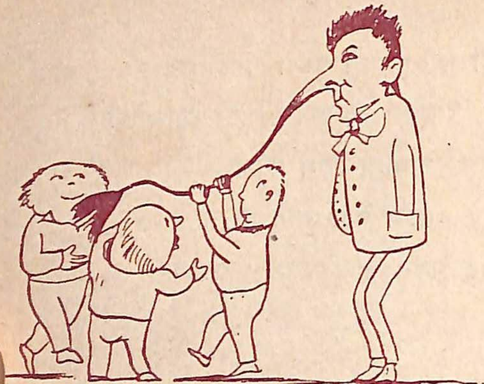




পাটনা থেকে এসেই বুড়ি উর্মিলাবাঈ
ব'ললো, 'হামার কামরা জরুর সাফ্ হোনা চাই।
হাটাও, হটাও আলপিন, ছুঁচ
লাগাও ঝাড়ু যিধার যো কুছ—
এমন উড়নচণ্ডী বুড়ি ব'লবো কি ভাই !

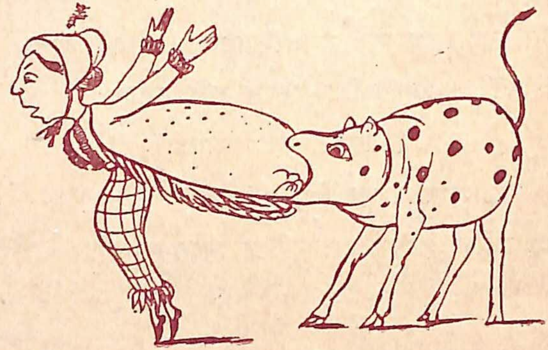
পাগলা বুড়ো থাকতো সে তো কাশ্মীরে
ভাবতে দেখে, লম্বা রোগা বাঁশ কি রে !
পাঁচিলটার ঐ ওপার থেকে
ভাবলো বুড়ো একটু দেখে
আছেই আছে মোটকা দুটো হাঁস তীরে !

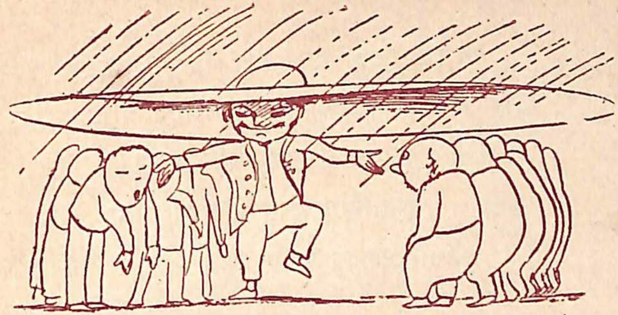




নাকের থেকে ঝুলছে বুড়োর ফিতের ঝালর
পরখ ক'রে দেখছে কেমন মন্দ-ভালোর !
'খারাপ কি আর,' ব'ললো সবে,
'ঘন্টা তো নয়, তবেই হবে।'
'সে কি রে বাপ্,' শুনেই বুড়ো হকচকালো !

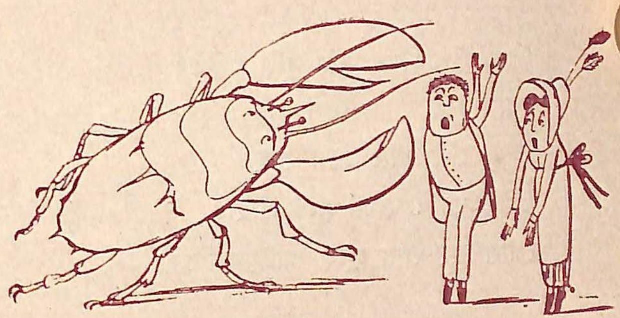
সেই যে মেয়ে থাকতো সে তো পাকপাড়া
পাড়-বসানো পরতো জামা খাপছাড়া !
বুটিদার এক বাছুর সুখে
আধেক পোশাক পুরলো মুখে
আতঙ্কে সে পড়লো হয়ে দিকহারা !





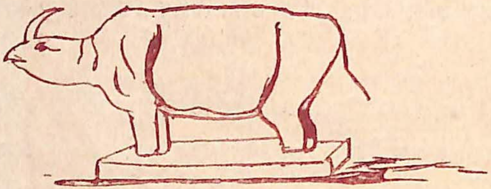
বুড়োর কাণ্ড এক্কেবারে আজগুবি যে
টুপির কানা চওড়া এমন বলবো কি যে!
ব'ললো সে তো ভুল না করে
শিলাবৃষ্টি হ'লে পরে,
'টুপির তলায় দাঁড়িয়ে থাকো কেউ না ভিজে।'

নদী তীরে বুড়ো হাঁটে বুড়ি নিলো সঙ্গ
ভয়ে হাঁটু নড়ে দেখে কাঁকড়ার রঙ্গ!
কাঁকড়াটা কাছে এলে
বুড়ো-বুড়ি ব'লে ফেলে,
'যাচ্ছি নে কোনোখানে, যাত্রা তো ভঙ্গ।'



চলতে চলতে আঠারো সপ্তার আগেই ওরা নিরাপদে ফিরে এল দেশে। দেশের লোক ওদের ফিরে পেয়ে খুব খুশি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এসে আনন্দে জড়িয়ে ধরল ওদের। এবং তখুনি ওরা ঠিক করল, খুব শিগ্‌গীরই ফের বেরিয়ে পড়বে বাদবাকী জায়গাগুলো দেখতে। পৃথিবী ঘোরার মতন এমন মজা আর দুটি নেই।

ও, হ্যাঁ, আসল কথাই তো বলতে ভুলে যাচ্ছি। সেই বুড়ো গণ্ডারটা, যার দৌলতে ওদের যাত্রা শেষ অবধি অতো আরামের হয়েছিল, তার কী হল জান? সে মারা যাওয়ার পর তার চামড়া দিয়ে ওরা একটা খড়ের পুতুল বানিয়ে বাইরের ঘরে স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি পাপোশের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল--ওদের আজব ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।





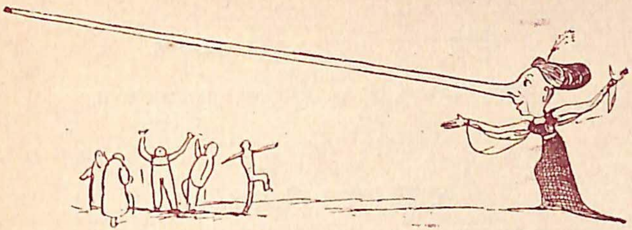
জাম্বলিগুলোর সবজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি



বেজায় ভুলো মস্ত-চুলো ব'সলো গাছের ডালে
উড়ে এলে দেশ-বিদেশের পাখি পালে পালে,
গাছের ডালেই দিব্যি খাশা
চুল ছিঁড়ে তার গ'ড়লো বাসা
ভুলো-বুড়ো করবে কি আর, পায় না পানি হালে।

বিষয়টি ঢাকার এক বুড়ি ঘটিতং
খোসামুদি না করিলে বুড়ি চটিতং!
মেয়েদের ধ'রে তাই
তাড়া ক'রে ছুটে ভাই
ঘোরাতো শহর জুড়ে অতি ঝটিতং!





বাপ্ রে কী নাক ঐ মেয়েটির নজর সবার কাড়ছে
শুধু শুধুই নাকের বহর বাড়ছে কেবল বাড়ছে!
বাড়তে বাড়তে ভাই রে
দেখতে না আর পাই রে
হারালো নাক এই ভেবে সে মাথায় চাপড় মারছে!

গায়ক বুড়োর বাপ্ রে সে কি গানের ঠেলা
তার পোষা হাঁস শূয়োর ধ'রে সারাবেলা
খাইয়ে তাদের কেবল ডুমুর
শোনাতো গান বাউল ঝুমুর
দামী মানুষ জোটায় নামী গানের চেলা!





হাবসির দেশে এক অদ্ভুত পরিবার
বলে, ‘হায়, এই ভবে কিছু নাই করিবার !’
‘গোল্লায় যাও তবে,’
তাড়া দেয় যেই সবে
অমনিই নেই আর লক্ষণ নড়িবার !

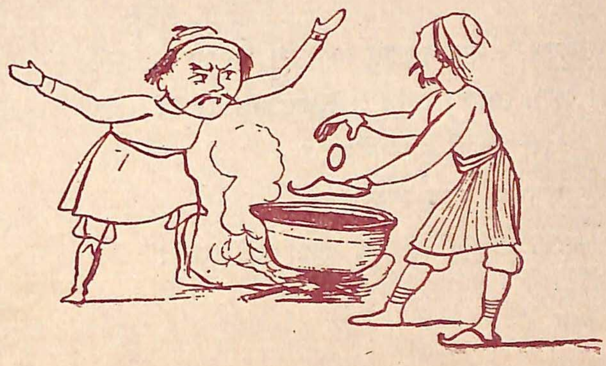
বিতৃষ্ণাতে কাতর হ’য়ে জীবনটাতে
বৃদ্ধ ব’সে দিন কাটাতেন অশ্রুপাতে !
খাইয়ে দিলো স্যালাড পাতা
সুর ক’রে সব শুনিয়ে গাঁথা
অমনি তিনি সুস্থ হলেন সাথে সাথে।

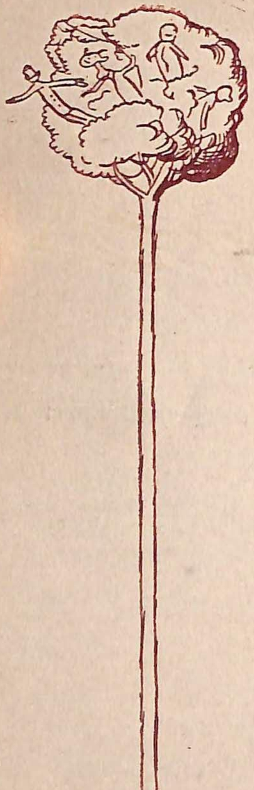




হঠাৎ সেদিন খেয়াল মাথায় চাপলো খুকুর
কিনলো ছোট আহলাদী এক খয়েরী কুকুর।
মাংস তাকে দেয় আগিয়ে
গরমা-গরম জ্যাম লাগিয়ে
খরচে-মেয়ের ঠিক ঠিকানা পদ্মপুকুর।

অবাক লাগে শুনলে বুড়োর রুচি হে
কোন কাজই ক'রতো না সে গুছিয়ে।
ব'ললো সবাই, 'জুতোয় ভ'রে
ডিম সেদ্ধ ক'রলে ওরে,
দেশছাড়া আজ ক'রবো তোমায় খুঁচিয়ে।'





বেগুনি সারাদিন ধরে একটা মাঠাতোলা পাত্রে সমুদ্দুরের নোনা জল তোলে আর তিন ভাই মিলে তার থেকে মাখন বার করতে চেষ্টা করে। চেষ্টাই শুধু সার হয়--মাখন বেরোয় কালেভদ্রে। সন্ধ্যে হলেই চারজনে গিয়ে ঢোকে কেট্‌লিতে। সেখানে আরামে নাক-ডাকিয়ে ঘুমোয়। এদিকে সারা রাত্তির নৌকোটাকে সামলায় পুষি আর হাট্টিমা-টিম-টিম।

এইভাবে দিন যায়, রাত কাটে। ওরা চলেছে তো চলেইছে। চারিদিকে শুধু জল, আর জল। কিছুদিন পর হঠাৎ দূরে একটা ডাঙ্গা দেখা গেল। দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ডাঙ্গাটার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে দেখল, ভারী মজার এক দ্বীপ সেটা। মাঝখানে জল আর চারপাশে জমি। উপচে-পড়া ঘুর্ণি জলের আঁকাবাঁকা রাস্তা--এই আছে, এই নেই। বিরাট একটা গাছ সেই দ্বীপে। পাঁচশো তিন ফুট লম্বা।

ওরা নামল সেখানে। ওমা, দু-পা এগোতে না-এগোতেই চক্ষু একেবারে ছানাবড়া! সারা দ্বীপটা বোঝাই শুধু মাংসের কাটলেট আর চকোলেটের টুকরো। জনপ্রাণীর কোন পাত্তা নেই কোনখানে। কিন্তু সত্যিই মানুষজন আছে কিনা সেটা তো ভালো করে দেখা দরকার। কাজেই ওরা উঠল সেই বিরাট গাছটাতে। একনাগাড়ে সাতদিন সেখানে কাটিয়েও কারো টিকিটি নজরে পড়ল না। তখন গাছ থেকে নেমে মাত্র দু হাজার মাংসের কাটলেট আর দশ লক্ষ চকোলেটের

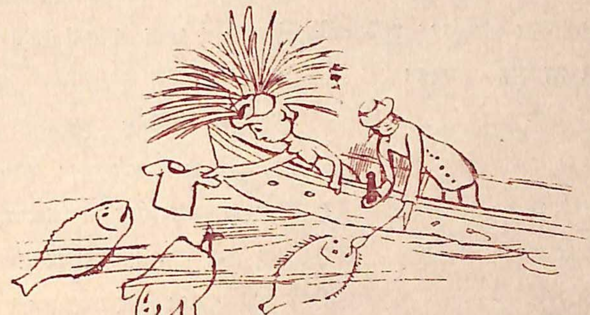


টুকরো ওরা ওদের নৌকোয় বোঝাই করে নিল। একমাস ধরে মৌজ করে সেগুলোকে সদ্ব্যবহার করল পরমানন্দে অথৈ জলে ভাসতে ভাসতে।



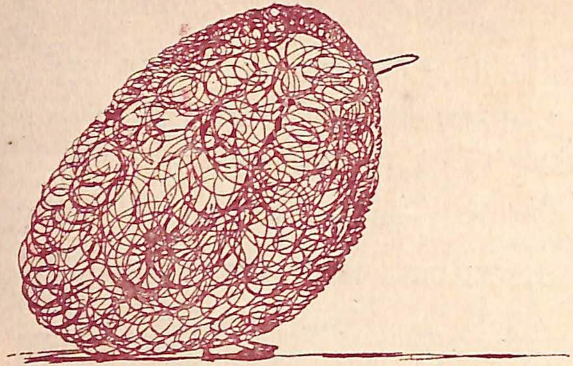
এরপরে যেখানে এসে ঠেকল তাদের নৌকো সেখানে কম করে অন্তত পঁয়ষট্টিটা নীল লেজঅলা টিয়া পাখির বাস। তাদের দিকে তাকালে তাকিয়েই থাকতে হয়। চোখ ফেরান যায় না সহজে। লজ্জার কথা কী বলব, কথা নেই বার্তা নেই পুষি বেড়াল আর হাট্টিমা-টিম-টিম আস্তে আস্তে গুড়ি মেরে গিয়ে তাদের লেজগুলোকে দিল কামড়ে। দেখে বেগুনি তো রেগে আগুন। খুব বকাবকি করল দুজনকে। কিন্তু পালকগুলোকে দেখে লোভ সামলাতে পারল না। লেজ থেকে খসে-পড়া দুশো ষাটটা পালক সে কুড়িয়ে নিয়ে লাগাল তার টুপিতে। আরে ব্বাস! টুপিটাকে তখন কী সুন্দর দেখতে হল! ঠিক যেন কোন রাজকন্যের মুকুট।

যেতে যেতে বাধল আরেক ঝামেলা। সমুদ্দুরের একফালি একটা জায়গায় এত মাছ গিজগিজ করছিল যে তাদের নৌকো আর এগোতেই পারে না। একেবারে নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। ঠায় ছ'সপ্তা আটকে থাকতে হল সেখানে। তবে একটা বাঁচোয়া, মাছগুলো ছিল চিংড়ি মাছের চাটনিতে ভেজান রান্না-করা সব শোল মাছ। তোফা খেতে। গপাগপ ওরা খেয়ে যেতে লাগল। খেয়ে খেয়েই প্রায় সাবাড় করে দিল সবাইকে।



নৌকো চলেছে। চলেছে---চলেছে---চলেছে।

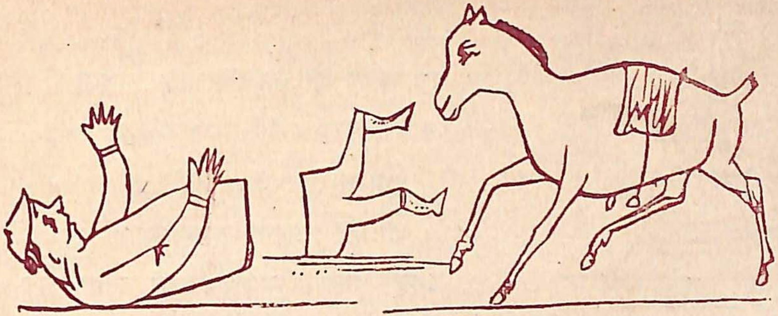
এবারে এসে থামল এক কমলালেবুর রাজ্যে। ইয়া বড় বড় লেবুভর্তি অজস্র গাছ চারিদিকে। ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে তাদের। ডাকছে নিয়ে যাবার জন্যে। পেল্লায় সেই কেটলিটাতে বোঝাই করে লেবু নেবে বলে



রসিক খুড়োর সবই কেমন সৃষ্টিছাড়া
পরচুলা এক কিনলো বেছে বাজার সারা!
সব কিছু তায় পড়লো চাপা
নাকটি কেবল আর দুটি পা
দেখলো সবাই হনহনিয়ে ঘুরছে পাড়া!

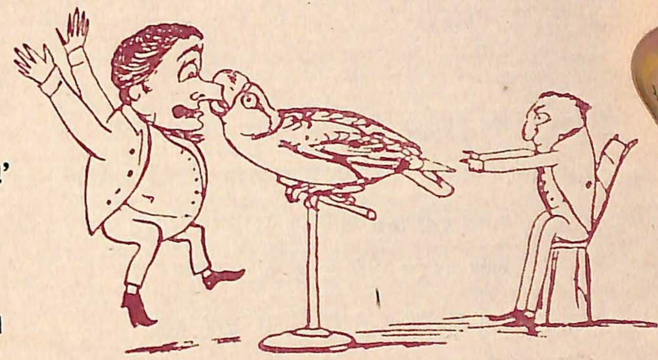
আজব কাণ্ড, এমন ব্যাপার দেখেছো কি কেউ?
গামলা চেপে দেবেন পাড়ি ঢেউয়ের পরে ঢেউ!
জল ঢোকে না গামলাতে
তাকেই ধ'রে সামলাতে
জলের-বুড়ো লাফান, হাঁপান, কান্না ভেউ-ভেউ!





নেপালের বাসিন্দা ঘোড়া থেকে পড়ে
দু'খণ্ড হ'য়ে বুঝি এইবারে মরে!
ভাগ্যিস ছিলো ওরা
কড়া গঁদে দিলো জোড়া
টুকরো দুটোকে এনে ঠিকঠাক করে!

নাকের ডগায় কাকাতুয়া যেই দিয়েছে কামড়ে
চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা তখন, 'হতচ্ছাড়া থাম রে!'
ব'ললে সবে, 'এই পক্ষী
নাম জান তো রাজলক্ষ্মী!'
মনের মতো নামটি শুনে জুড়িয়ে গেলো ঘাম রে।





শখ ক'রে সে ব'সেছিলো রান্নাঘরে
দেখবে ব'লে বৌটি কেমন রান্না করে!
ভুল ক'রে বউ একটিবার
তাকেই ঢোকায় চুলায় তার
'গেলুম বাবা!' বুড়োর তখন কান্না ঝরে!

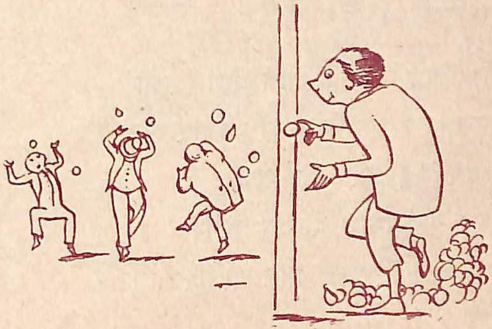
পাতলা যেন ছিলকা কাঠের বুড়ো সে মালদায়
দিনে দিনে আরও তো ভাই পাতলা হ'য়েই যায়!
শাদা পোশাক প'রিয়ে তাকে
শক্ত ক'রে গুটিয়ে রাখে
সবাই মিলে নুইয়ে-পড়া বুড়োকে তাই হায়!





বুড়োটা ভাই একেবারেই ছন্নছাড়া
জীবনে সে সব কিছুতেই নিয়মহারা!
টুপিতে চা তৈরি ক'রে
নাচতো হুলো-বেড়াল ধ'রে
বিরক্ত তাই ছিলো পাড়ার কর্তা যারা।

খেয়াল বুড়োর বিটকেলে যে এমন তরো
কিনে আপেল, নাশপাতি এই বড়ো-বড়ো
পাঁচ শ' এবং নব্বুইটা জুড়ে
আচমকা তা মাথায় মারে ছুড়ে
আঘাত পেয়ে পথের মানুষ ভয়েই জড়োসড়ো!

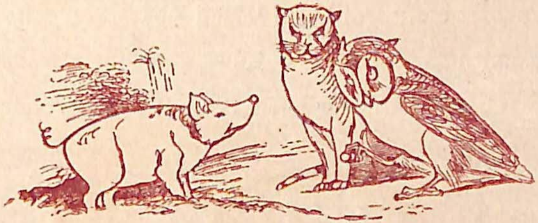




পেঁচা ও পুষি বেড়াল

পেঁচা এবং পুষি বেড়াল সবুজে নায়ে লাগিয়ে হাল
সাগর পানে চ'ললো ভেসে জোরে
নোটে মুড়ে একশ' টাকার খুচরো নিলো সঙ্গে দেদার
এবং নিলো মধু কিছু ভ'রে।
তারার পানে চেয়ে চেয়ে বাজিয়ে গীটার উঠলো গেয়ে
বিভোর পেঁচা ভীষণ খুশি——
মনের মতো পুষি আমার তোমায় আমি পেয়ে
কি যে করি, ভেবেই মরি, ওগো পুষি!
ওগো পুষি
ওগো পুষি
কি যে করি, ভেবেই মরি, ওগো পুষি!

ব'ললো পুষি, 'পেঁচক-পক্ষী, তুমি কি শান্ত, তুমি কি লক্ষ্মী
গাও গুন্ গুন্ দু' কান জুড়ানো গানটি!
অনেক দিন তো কাটলো গিয়ে, এসো এবার ক'রবো বিয়ে
কিন্তু নেইকো মনের মতো আংটি।'



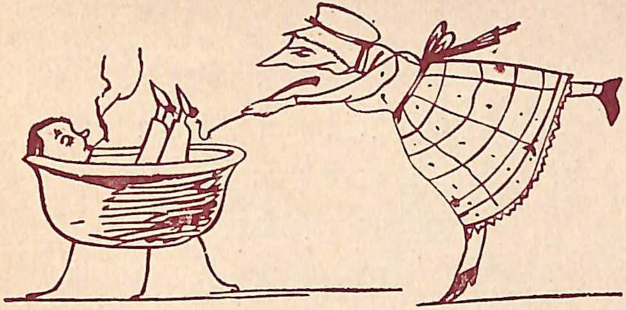
একটি বছর একটি দিন কাটিয়ে ভেসে ক্লান্তিহীন
বং বৃক্ষের দেশে তারা পৌঁছে গেলো সোজা
দেখলো সেথায় বনের কাছে শুয়োর-ছানা দাঁড়িয়ে আছে
নাকের ডগায় আংটি আছে গোঁজা।
আছে গোঁজা
আছে গোঁজা
নাকের ডগায় আংটি আছে গোঁজা।



সেই যে বুড়ো বাস করতো মিহিজামে
সবাই জানে তারই মেয়ে দীপ্তি নামে
পরচুলা এক ছোট্ট মতো
মাথায় প'রে ক্রমাগত
দিন-দুপুরেই শুয়োর চেপে ঘুরতো গ্রামে।

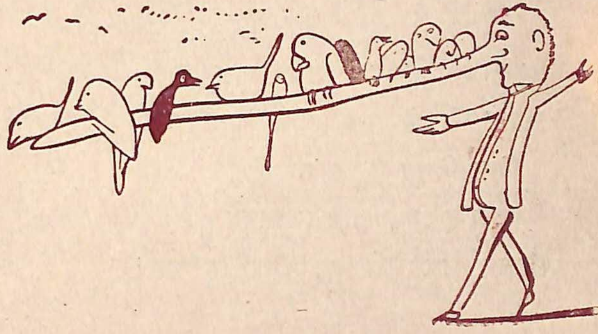


মাথার মালায় গাঁথা আছে বিচ্ছিরি লোকটার
গলদা-চিংড়ি, কাসুন্দি ও পেঁয়াজকলি, আর
ইঁদুর চারটে হিসেব মতো
রাঁধার মশলা ইতস্তত
উপাদানের কিবা ছিরি আজব মালিকার!



চিন্তামগ্ন চলছিলো এক আমলায়,
কি ক'রে যে প'ড়লো ঝোলের গামলায়,
বুদ্ধিমতী রাঁধুনি
সব কাজেতেই বাঁধুনি,
হুক দিয়ে সে টেনে তুলে সামলায়।

নাকের ডগায় পাখ-পাখালির বাসা
সারাটা দিন রোদ পোয়ানো খাশা!
ব্যতিব্যস্ত নাকের মালিক
ভরসা শুধু রাত্রি-কালিক—
রয় না পাখি, শূন্য থাকে নাসা।



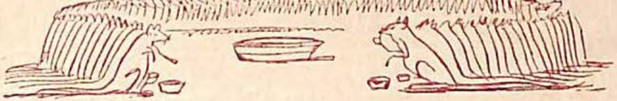


কেটলিটা নিয়েই নেমে পড়ল ওরা নৌকো থেকে। বেশ কুড়োচ্ছিল। হঠাৎ ফুরফুরে হাওয়া ঝড়ের মতন বইতে শুরু করল। বেগুনির অমন সাধের টুপিটার বেশির ভাগ পালকই উড়ে গেল তার দাপটে। দমাদ্দম আরম্ভ হল লেবুবৃষ্টি। মাথায়, পিঠে, মুখে। কার সাধ্য সেখানে থাকে! প্রাণ বাঁচাতে ওরা দৌড় দিল নৌকোর দিকে। ওদিকে চায়ের কেটলিতে কমলালেবুর প্রাণ-বেরিয়ে-যাওয়া ভয়ংকর মিষ্টি রুনুঝুনু বাজনা বাজছে। যন্ত্রণাতে কাতরাতে কাতরাতে ওরা শেষ অবধি ভালো ভাবেই নৌকোয় চাপলো। হাট্টিমা-টিম-টিমের ডান পায়ে এ্যায়সা লাগা লেগেছিল যে বেচারা নিজের চটিতে সপ্তাখানেক মাথাগুঁজে গোঁজ হয়ে বসেছিল।



এই অঘটনে কিছু সময়ের জন্যে ওরা সকলেই খুব মনমরা হয়ে গেল। একমাত্র সিংহের পো-ই তখন বুদ্ধি করে দারুণ ধৈর্য আর নিষ্ঠা সহকারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শিস দিতে শুরু করলে। ফলে আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে উঠল সবাই। ফিরে পেল তাদের পুরোনো উদ্যম।





আবার ভেসে চলার পালা।

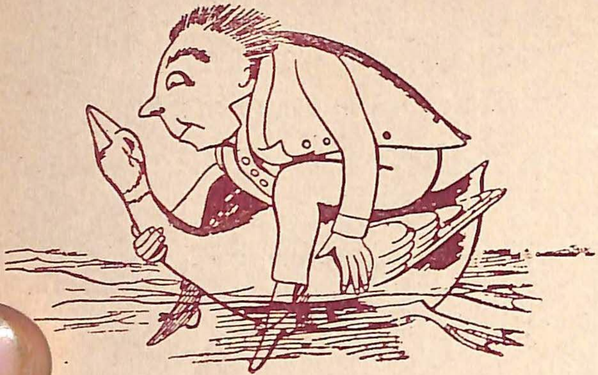
বেশ কয়েকদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। ধীরে-সুস্থে ওরা গিয়ে পৌঁছল লাল-চোখো শাদা ইঁদুরের দেশে। অগুনতি লাল-লাল চোখঅলা শাদা-শাদা ইঁদুর তরিবৎ করে বসে বসে পায়েস খাচ্ছিল। দেখে ওদের নোলায় জল এল। কেননা, এতদিন শুধু শোল মাছ আর কমলালেবু খেয়ে খেয়ে জিব একেবারে হেজে গেছে। অতএব সাব্যস্ত হল, ইঁদুরদের তুতিয়ে-পাতিয়ে খোশামোদ করে ওরা খানিকটা পায়েস চেয়ে নেবে।

খড়ের-সংকে বলা হল ইঁদুরদের কাছে পায়েসের জন্যে আর্জি পেশ করতে। খড়ের-সং একপায়ে খাড়া। তক্ষুণি ছুটল আর্জি নিয়ে।

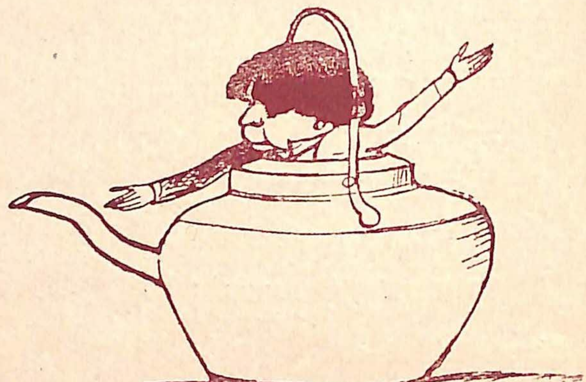
ইঁদুররা অবশ্য তাকে একেবারে নিরাশ করল না। একটা আখরোটের খোলায় আধঘোলা জলে তৈরি একটুখানি পায়েস দিল। ইঁদুরদের এই ব্যবহারে তিরিক্ষি হয়ে উঠল খড়ের-সং-এর মেজাজ। বললে, এত পায়েস রয়েছে তোমাদের, আর একটু বেশি দিতে পারছ না? কি কিপটে গো তোমরা?

কিন্তু খড়ের-সং-এর কথা শেষ হল না, ইঁদুরগুলো ওর দিকে ঘুরে হাঁচতে শুরু করলে। কী বিকট আর মারাত্মক সেই হাঁচি! লক্ষ লক্ষ ইঁদুরের একত্রে হাঁচির বিকট আওয়াজ কল্পনার বাইরে। খড়ের-সং রেগেমেগে তার টুপিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল পায়েসের হাঁড়িতে। পায়েসটাকে নষ্ট করে ছুটে পালিয়ে এল তাদের নৌকোয়। খুব হয়েছে বাবা! আর পায়েস খেয়ে কাজ নেই—এখন ভালোয়-ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব তড়িঘড়ি ওরা খুলে দিল ওদের নৌকো।





হাঁসের পিঠে সাগর দিলো পাড়ি
সেই যে বুড়ো থাকতো মতিহারী!
মাইল খানেক গিয়ে জলে
দেখে শুনে বুড়ো ব'লে,
'সাধ মিটেছে, ফিরবো এবার বাড়ি।'



বুড়োটা তো যখন-তখন ছেলেবেলায়
ঝুরতো ঝাঁপাই কেটলিটাতে অবহেলায়!
কিন্তু বিপদ বড় হ'য়ে
আটকে সেথা যায় যে র'য়ে
জীবন গেল কেটলিটাতেই কাটিয়ে হায়!



এমন মানুষ দেখেছো কেউ ধারে-কাছে
দাঁড়কাকটার সঙ্গে তাথৈ তাথৈ নাচে!
'এই পাখিকে লাই
মোটেও দিতে নাই',
খতম ক'রে বুড়োটাকেই সবাই বাঁচে!

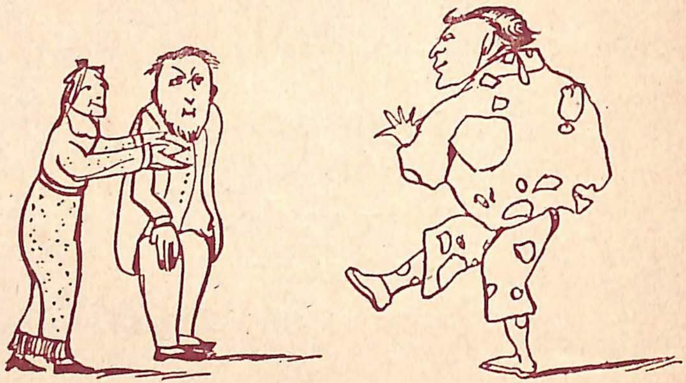
এক পায়ে খাড়া হয়ে পাহাড়ের শীর্ষে
হোমার কাহিনী পড়ে, কতো বড়ো বীর সে!
পা'টি ক্রমে আসে ধ'রে
লাফিয়ে উঠতে ওরে
খাদে প'ড়ে একেবারে হ'লো চৌচির সে!

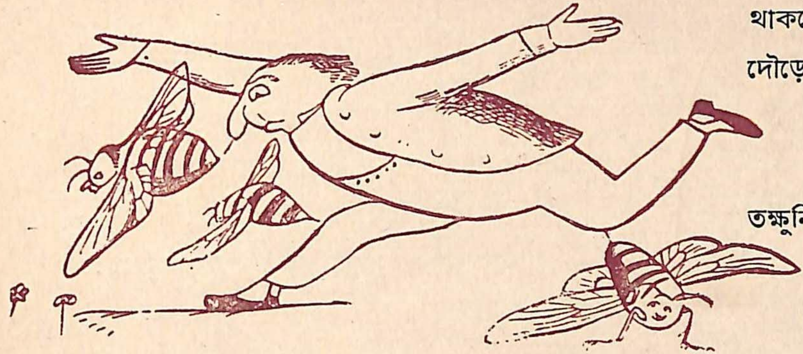




লক্ষ্ণৌবাসী সে যে মন পরিশীলিত
প্রতি আচরণে তার পরিচয় মিলিত।
ছাতা কিনে সুন্দর
ঢুকলো ভাঁড়ার ঘর
ছাতার বাহার কিবা, রঙ ফিকে নীলই তো!

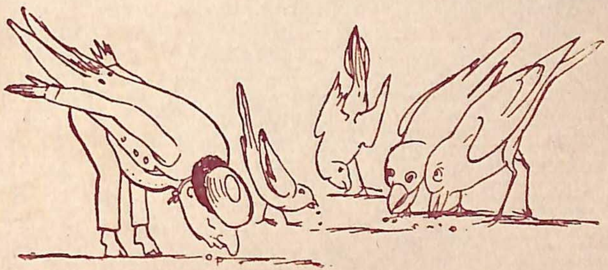
বুড়োর বাড়ি ছিলো অজন্তায়
রিপু-করা পরতো জামা গায়!
ব'ললো সবাই, 'সন্দেহ নেই
ফেলবে ছিঁড়ে এক নিমেষেই;
পাগলা বুড়োর ব্যাপার বোঝা দায়!'





থাকতো বুড়ো গণ্ডগ্রামের পাঠশালাতে
দৌড়েছে যেই নীলচে ঘাসের মাঠ পালাতে
মৌমাছি হুল অমনি ফোঁড়ায়
নাকে এবং হাঁটু জোড়ায়
তক্ষুনি তাই ফিরলো সে তার আটচালাতে।

রামপ্রসাদের গ্রামসুবাদে খুড়ো
হঠাৎ এসে এল-হাম-এ সেই বুড়ো
মাটির থেকে তুলে খেতো
পাখির দলে মিশে সে তো
গলির এবং রাস্তারই খুদকুঁড়ো!



৬

হতুমথুমো হ'লে আঙুলহারা
তুলে তাকে সযত্নে এক নৌকো ক'রে নিয়ে
পৌঁছেছিলো সবাই মিলে তারা
বাগানেতে ঘুমপাড়ানি মাসির কাছে গিয়ে।
রেঁধে ডিমের এবং কুমড়ো-ফুলের সঙ্গেতে মাছভাজা
মাসি তাকে মনের মতো ভোজ খাইয়ে তাজা
ব'ললো, 'আরে, সবাই জানে বিশ্ববাসী যারা
হতুমরা সব সুখীই তো হয় পায়ের আঙুল ছাড়া!



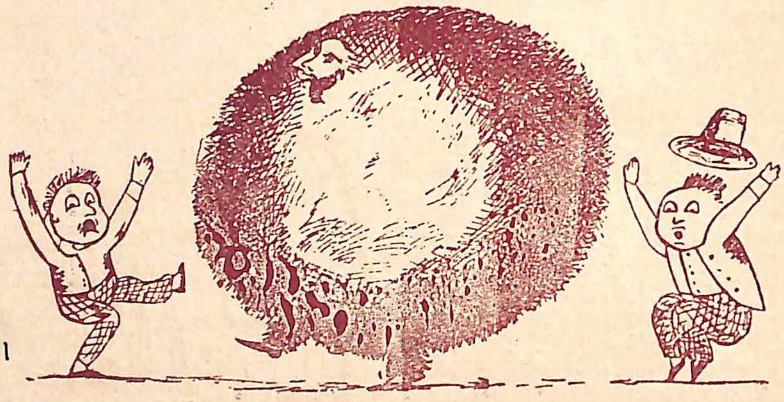
হাঁস ও ক্যাঙারু-ভাই

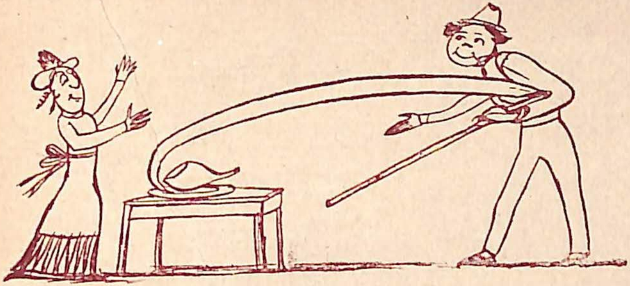
হাঁস ব'ললো, 'ক্যাঙারু-ভাই, ক্যাঙারু-ভাই
লাফাও তুমি কেমন চমৎকার
মাঠ পেরিয়ে, ঘাট পেরিয়ে পালাই-পালাই
ইচ্ছে তোমার থামবে নাকো আর!
বিশ্ব-ভ্রমণ দূরের কথা—ডোবা
সঙ্গী ক'রে জীবন-জলে চোবা
ইচ্ছে করে তোমার মতো আমিও লাফাই,
হাঁস ব'ললো, 'ক্যাঙারু-ভাই'!



মানী বুড়ো দেখতে গিয়ে রথের মেলা
ব'ললো, 'এবার করবো শুরু অশ্রু ফেলা !'
সবাই বলে, 'কাঁদলে তোমায়
মারবো এমন কালসিটে গায়
প'ড়বে যখন, বুঝবে তখন কাঁদার ঠেলা !

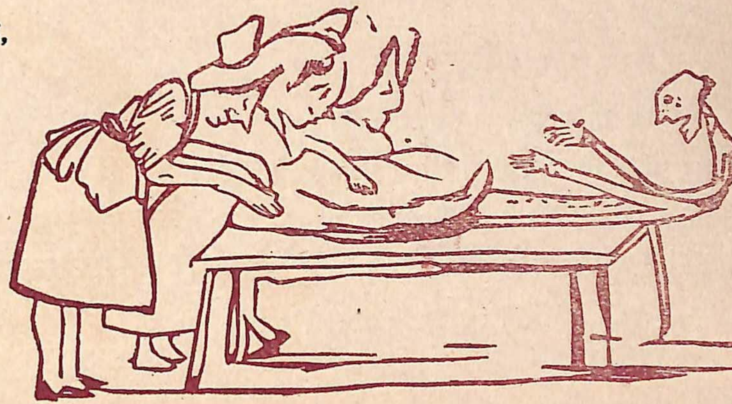
সিমলার বাসিন্দা শ্রীমান বাবু
শীতের ছোঁয়াচ পেলে একেবারে কাবু !
কিনে তুলো, কিনে ফার,
দস্তানা চামড়ার
আরামে জড়িয়ে ভাবে, শীত জল-সাবু।

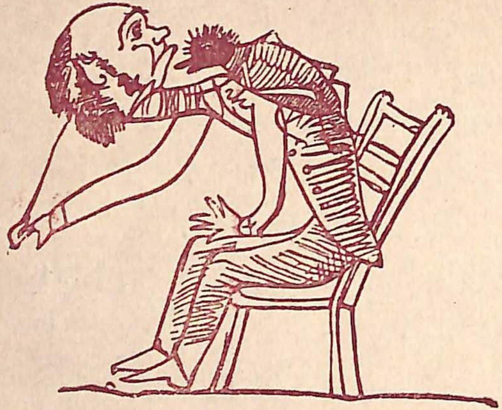




বুড়োটা খুব আস্তে আস্তে আসতে গিয়ে
ফাটলো খানিক মাংস বিরাট কাস্তে দিয়ে।
ক'রলো সবাই নিন্দাবাদ,
'কাস্তে আমার জিন্দাবাদ',
ব'লেই সে তার ঠোঁট চাপলো হাসতে গিয়ে!

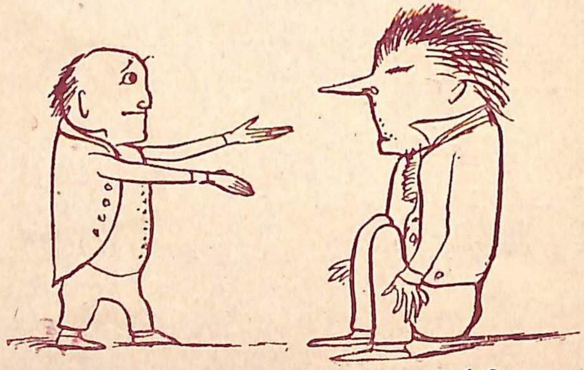
বার্লিনে বাস করতো বুড়ো
খোঁজ বলো তার কেই বা রাখে,
ভীষণ রোগা লিকলিকে সে
চুপচাপ তাই একলা থাকে!
ভুলের বশে সবাই মিলে
পুলি পিঠেয় মিলিয়ে দিলে
পিঠের সঙ্গে মিশে গেলো
পাচ্ছি নে আর খুঁজেই তাকে!





এই বুড়োটার বিপদ দেখো আরে
ঝিঁঝিঁপোকা চেপেছে এক ঘাড়ে!
'ছুঁচ ফুটিয়ে তোকে
পাঠাবো যমলোকে,'
রেগেমেগে বুড়োটা হাঁফ ছাড়ে।

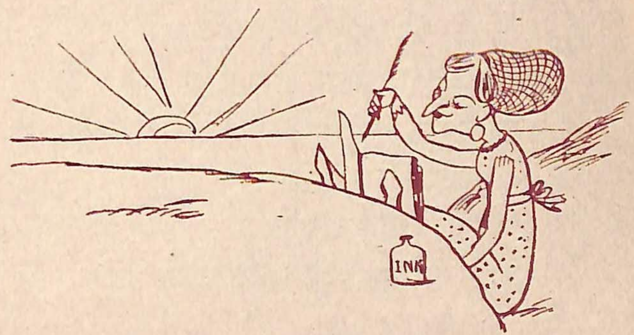
বুঝি না বুড়োর এ কেমন ফন্দি রে
সটান গিয়ে ব'সলো সে নাট-মন্দিরে!
শুধায় সবাই, 'একি বসার ঢং?'
উত্তরে সে ব'ললো কেবল, 'বং!'
বুড়োটা যে বিটলে এমন ব'লবো কি রে!

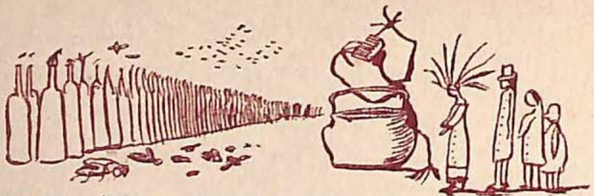




বাপ কি মানুষ ভাই কলকাত্তাই মানুষটা
দিনরাত্তির গিলত এমন থাকতো না ছাই হুঁসটা!
গিলতে গিয়ে মাখন-রুটি
বিশ্ব থেকে মিললো ছুটি
আপ্‌সোস তার রয়েই গেল, চাখলো না সে জুসটা।

এই মেয়েটির জানতো না কেউ ব্যাপার-স্যাপার কি তা
আপন মনেই থাকতো মেয়ে ছিলো না কেউ মিতা!
খাতার পাতায় কলম ঘ'ষে
কোন পরিখার ধারে ব'সে
ফেললো লিখে ছোট্ট সে এক ঐতিহাসিক গীতা!





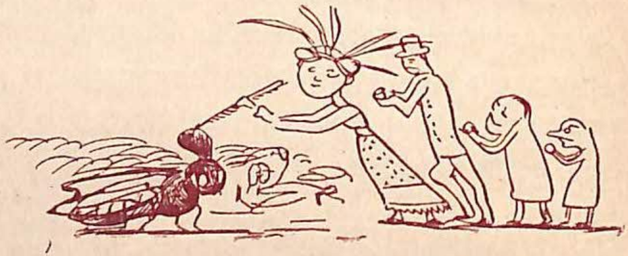
ফের সেই অকূল দরিয়া। সেই ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলা।

এবার যেখানে এল, সেখানে একটাও বাড়িঘর নেই—আছে অসংখ্য নীল রঙের ছিপি-খোলা শিশি। মিষ্টি চোখ-জুড়নো নীল রঙ। প্রত্যেক শিশির মধ্যে আবার একটা করে নীল মাছি। তারা গুণগুণ করে গান গাইছে। অদ্ভুত মেঠো সেই সুর। নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি নেই, বিবাদ নেই। যে-যার শিশিতে সুখে বাস করছে। বেগুনি, হাতুড়ি-পেটা, খড়ের-সং, সিংহের-পো—সকলেই দেখে খুব অবাক হয়ে গেল।

নীল-শিশি-মাছিদের অনুমতি নিয়ে ওরা তীরে নৌকো ভেড়াল। একটু চা না খেলে আর চলছিল না। শিশিগুলোর সামনে ওরা চা করতে বসল। চায়ের পাতা ফুরিয়ে গিয়েছিল, কাজেই গরম জলে কিছু নুড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। হাড্ডিমা-টিম-টিম তার একোর্ডিয়ানটাকে বার করল। সুন্দর একটা গৎ বাজাতেই আপনা থেকে চমৎকার চা হয়ে গেল।

চা খেয়ে চারজনে নীল-শিশি-মাছিদের সঙ্গে শুরু করল গল্পগুজব। মাছিরাও খুব শান্ত আর ভদ্রভাবেই তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলে। অবশ্য মাছিদের কথা বলার ভেতর একটা গুণগুণানি টান ছিল। কেননা ওরা ওদের দাঁতের ফাঁকে ছোট্ট কাপড়ের বুরুশ আটকে রাখে—তাই কথা বলার সময় একটা হিস-হিস আওয়াজ হয়।

বেগুনি জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তোমরা এই শিশির মধ্যে বাস কর কেন দয়া করে বলবে? আর শিশির মধ্যেই যদি থাক, তাহলে সবুজ বা ময়ূরকন্ঠী কিম্বা হলদে শিশির মধ্যে থাক না কেন?



উত্তরে একটা নীল-মাছি বললে, ব্যাপারটা কী জানো, আমরা জন্মেই দেখি এই শিশিগুলো আমাদের বাস করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। আমাদের ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা এগুলোকে তৈরি করে গেছলেন। আমরা তাই জন্মের পরই এর মধ্যে ঢুকে পড়ি। শীত এলে শিশিগুলোকে উল্টে নিই। তাতে আমাদের আর ঠাণ্ডা লাগে না। অন্য রঙের শিশিতে কিন্তু এসব চলবে না, সে কথা তো তোমরা ভাল করেই জানো।

হাতুড়ি-পেটা আমতা-আমতা করে বললে, হ্যাঁ, তা চলবে না ঠিকই—কিন্তু তোমরা কী খেয়ে পেট ভরাও জানতে পারি কি?

নীল-মাছি জবাব দিল, প্রধানত শামুকের তৈরি পিঠেই আমাদের খাদ্য। অবশ্য যখন তা পাওয়া যায় না, তখন খাই বৈঁচির কাঞ্জি আর সেদ্ধ করতে করতে আমসত্ত্ব হয়ে যাওয়া রাশিয়ান চামড়া।

খড়ের-সং হুস করে জিবের ঝোল টেনে বলল, আঃ, কী সোয়াদ!

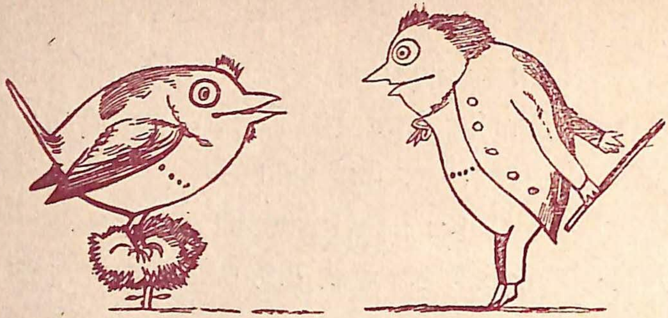
সিংহের-পো ফোড়ন কাটল, উঃ, দারুণ!

আর নীল-শিশি-মাছিরা সমস্বরে বলে উঠল, গুণ গুণ।

এমন সময়ে মাঝবয়সী একটা মাছি স্মরণ করিয়ে দিল, আরে-আরে, বিকেলের গান গাইবার সময় হয়ে গেল যে!

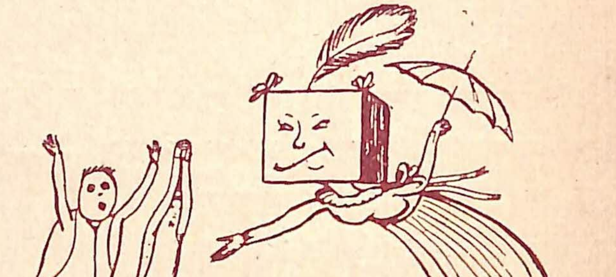
ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে এক ইশারায় সমস্ত নীল-শিশি-মাছিরা গুণগুণিয়ে সপ্তমে কালোয়াতি ধরল। সর্দি-ঝরার মত সুরের সেই ঘড়ঘড়ে গমক ছড়িয়ে পড়ল কূল-কিনারাহীন জলের ওপর। পথ-আগলে দাঁড়িয়ে-থাকা শান্ত ক্যাবলাকান্ত সবুজে পাহাড়টার চুড়োয় হারিয়ে-যাওয়া চামচিকেদের হট্টগোলকেও ছাপিয়ে ভেসে চলল সেই সুর। তারা-ঝকমকে আকাশ থেকে তখন উপছে পড়ছে চাঁদের আলো—সেই আলোয় নীল-শিশি-মাছিদের তেল-চকচকে শরীরের দু' পাশে, ডানায় আর পেছনের দিকে অদ্ভুত এক জংলী আভা ফুটে বেরুচ্ছে। আকাশের মতন নীলচে চোখ-জুড়নো সেই আসরের খুশি দেখে দিগ্বিদিকও স্থির থাকতে পারল না—হেসে ফেলল ফিক্ করে।

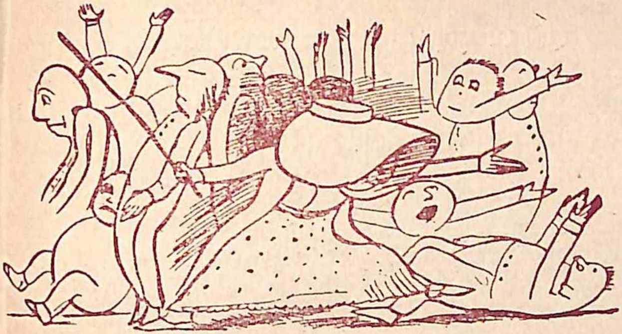
সেই সন্ধ্যের কথা ওরা বহুদিন ভুলতে পারে নি। প্রায়ই মনে পড়ত, আর ভারী ভালো লাগত।



বললো বুড়ো হঠাৎ সেদিন জোরসে হেঁকে,
'পাখির কথাই ভাবছি মনে ঝোপটা দেখে!'
'ছোট্ট পাখি?' শুধায় সবাই
'একদম নয়,' বললো সে ভাই,
'চার গুণ তো বড়ই হবে ঝোপের থেকে!'

সুন্দরী তরুণীর হাতে ছিলো ছাতা
অদ্ভুত রকমের চৌখুপি মাথা!
মাঝে মাঝে হাওয়া বুঝে
সোনার পালক গুঁজে
দিতো না সে ফেলতেই কারো চোখে পাতা!





ভিড়ের মাঝে পড়লো বুড়ি কী ঝকমারি
ভিড় হঠাতে চললো লাঠি এলোপাথাড়ি !
লাঠি খেয়ে কেউ পড়লো শুয়ে
ল্যাং খেয়ে কেউ পড়লো ভুঁয়ে
ভিড় সরলে বাড়ির পানে দেয় সে পাড়ি !

মহিলাটি ফরাসিনী খুশি মনে তাই
ভাবলেন হাঁসেদের নৃত্য শেখাই !
তাল ঠুকে ব'ললেন, 'ধিক তাক ধিন তা'
'কোয়াক-কোয়াক' ডাকে হাঁসদের চিন্তা
বেরিয়ে মেটালো শখ, শেখানো ছাড়াই ।





সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো বাগমারী!
পেঁচার বাসাই, ক'রেছিলো ঘরবাড়ি!
ডাকলে পেঁচার ঝাঁক
সে-ও লাগাতো ডাক
বে-আক্কেলে বুড়োটা কি রাশভারী!

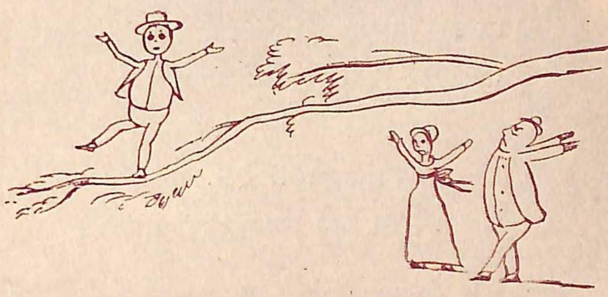
সুন্দরী সে সবার মনের মত
ক'রতো খুড়ো হাওয়া ক্রমাগত!
হাওয়ায় গেলে মুণ্ডু ভেসে
ব'ললো মেয়ে মিষ্টি হেসে,
'করিৎকর্মা লোকটি তুমি কত!'





সেই যে মেয়ে বাস করতো বাংলাদেশ
কুঁকড়ে কুঁকড়ে বাড়তে বাড়তে মাথার কেশ
জড়িয়ে গেলো গাছের তলে
ছড়িয়ে গেলো সাগর জলে
বৃদ্ধি পাওয়ার তবুও যে তার নেইকো শেষ !

ব'ললো বুড়ো, 'গাছের ডালে একটুখানি নাচি!'
'কি বেয়াকুফ !' অবাক সবে, 'বেরোয় যদি হাঁচি,
ভাঙবে তো ডাল মড়াৎ
ভাঙবে তোমার বরাত
দোহাই বাবা, কখ্‌খনো নয় এমন নাচানাচি!'



'তাই রে নাই রে, আমরা আছি সুখে
ছাঁকনি চেপে বয়েমেতে ঢুকে
শুকিয়ে-পড়া চাঁদনি আলোর দোলে
ছায়ায়-ঢাকা খয়রী পাহাড় কোলে
মটর-রঙের সবুজে পালের নায়ে
ক্রমাগত ইতস্তত
ফেলছে ছায়া চাঁদনি-আঁধারী।'
জাম্বলিগুলোর সবুজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি।

৫

দেখলো ডাঙা পশ্চিমেতে সাগর পেতে, দেখলো ডাঙা
ভর্তি কেবল গাছ-গাছালির ঝাঁক।
কিনলো সেথায় আতপ চালের কাঁড়ি,
আচার, পেঁচা, আস্ত গোরুর গাড়ি,
রুপুলি সব মৌমাছিদের চাক!

চমৎকার এক বাঁদর কিনলো ওরা
মিষ্টি-মঠের তৈরি থাবা জোড়া ;
কিনলো পনির এবং শুয়োর ছানা,
শিশি চল্লিশ পচা-ডোবার পানা,
গোটা কয়েক সবুজেটে দাঁড়কাক।
আধেক ভাঙা, আধেক রাঙা
দেখলো ডাঙা ভর্তি গাছের সারি।
জাম্বলিগুলোর সবুজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি।

৬

ভাবলো ওরা গণ্ডা পাঁচেক বছর পরে, ভাবলো ওরা
এবার তো যাক ঘরের দিকে ফেরা।
ফিরলে ওরা ব'ললো সবাই দেখে
'চিচিংফাঁকের গুহার মধ্যে থেকে
তে-ঠেঙ্গে সব লম্বা হ'লো ওরা!'



চামড়ার টুপিতেই মাথা ঢেকে নিয়েছে
তারপরে তিন সারি পালক সে দিয়েছে
তা ছাড়াও লাল ফিতে লম্বা
এই মেয়ে কি সে যান কম বা
রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে সে যে গিয়েছে !

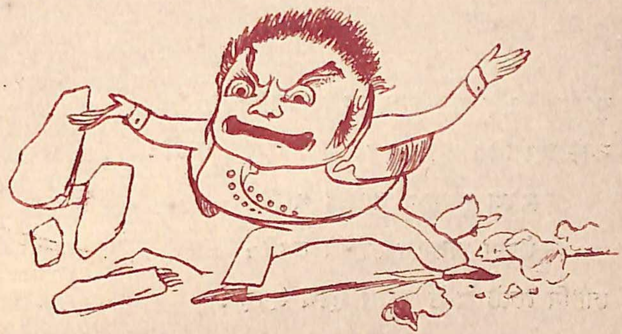
লোকটা আরাম ক'রে কালো কোট প'রলো
গঙ্গাফড়িং পিঠে কোন ফাঁকে চড়লো !
তারপরে গানে গানে
ভ'রে দিলো তারই কানে—
অজ্ঞান হ'য়ে ভয়ে লোকটা তো মরলো !

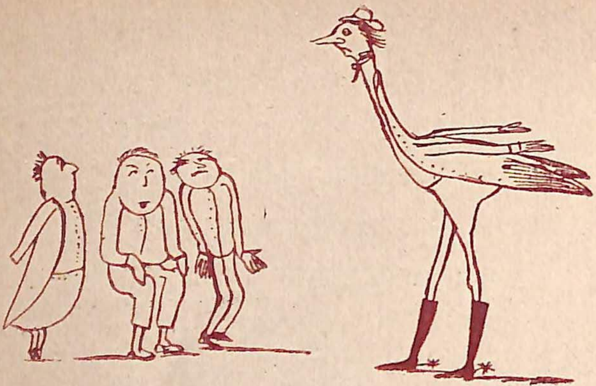




সেই যে বুড়ি থাকতো সে তো নীলাচলে
যখন-তখন ডুব মারতো সাগর তলে!
থালাগুলো ধুয়ে-মেজে
মাছকে আদর ক'রে যে সে
আসতো ফিরে, থাকতো না আর গভীর জলে!

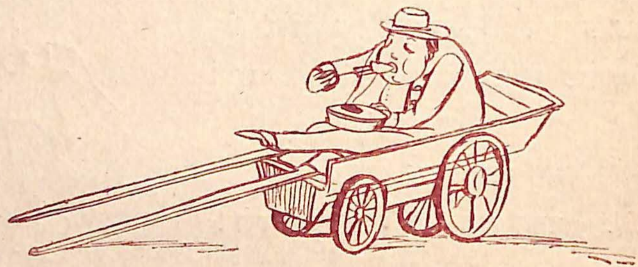
ভারি বদরাগী ছিলো দিল্লীর বুড়ো
আদতে খারাপ মাথা হয়তো বা পুরো!
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে
দশ ক্রোশ যায় ছুটে
ছিঁড়ে ফেলে কম্বল, ভাঁড় ক'রে গুঁড়ো!





দেখতে সারস একটা বুড়ো ডানবেলনেতে থাকতো
চলতে ফিরতে সবাইকে সে ত্রস্ত সদাই রাখতো !
লম্বা লম্বা পাগুলোকে
ব'ললে দেখে বন্ধুলোকে,
'ডানবেলন এই ছেড়ে ওটা অন্য কোথাও যাক্ তো !'

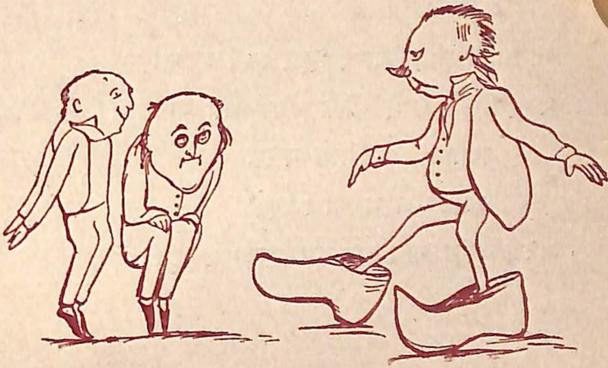
বুড়োর বাড়ি সবাই জানে তিনপাহাড়ী
কাটাতো দিন আহা সে কোন দুঃখে ভারী !
ব'সে গোরুর গাড়ির পাটে
ঠাণ্ডা আপেল চাটনি চাটে ;
চাটনি চেটে স্বস্তি আসে দুঃখ ছাড়ি !





পথের মাঝে একলা ভালুক এমনতরো ক'রলে তাড়া
ছুটতে গিয়ে ছোট্ট মেয়ে হকচকিয়ে দিশেহারা !
ছুটতে ছুটতে অবশেষে
ক্লান্ত হ'য়ে বেজায় ক্লেশে
প'ড়লো ধপাস, এক নিমেষেই
প্রাণপাখি তার খাঁচা-ছাড়া !

ঢাকুরিয়ার সবার ইয়ার ভুতো
কিনলো নতুন এক জোড়া সে জুতো।
'লাগছে আরাম?' লোকরা যত
শুধালে কয়, 'আপাতত
নেইকো আরাম, খাচ্ছি পায়ে গুঁতো !'



যাই হোক, মাঝরাত্তিরে ওরা সেখান থেকে নৌকো ছেড়ে দিল। হাট্টিমা-টিম-টিম যেভাবে নৌকোটাকে সাজিয়ে রেখেছিল তার এতটুকু এদিক-ওদিক হয় নি। চায়ের কেটলি আর মাঠাতোলা বোয়েম যেখানে থাকার ঠিক সেখানেই রয়েছে। পুষি বেড়াল বসেছে হালে। চার ভাইবোন একে একে নৌকোয় উঠল। নীল-শিশি-মাছিরা অবাক হয়ে ওদের চলাফেরা দেখছিল। ওরা চলে যাচ্ছে বলে দুঃখও হচ্ছিল তাদের। বিদায় নেওয়ার আগে বেগুনি হঠাৎ নৌকো থেকে নেমে এল। তার কাছে সেই টিয়ার লেজের সুন্দর পালক তখনও কয়েকটা ছিল। ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে একটা পালক সে নীল মাছির চুলের পেছনে আটকে দিল। হাতুড়ি-পেটা, খড়ের-সং আর সিংহের পো-ও মাছিদের তিনটে ছোট ছোট বাক্স উপহার দিল। বাক্সের একটায় ছিল কালো পিন, আরেকটায় শুকনো খড়, অন্যটায় বিট নুন। এগুলো পেয়ে মাছিরা খুব খশি। বার বার ওদের অভিনন্দন জানাতে লাগল।

নীল-শিশি-মাছিদের ছেড়ে এসে সত্যিই ওরা খুব মুষড়ে পড়েছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল তাদের কথা আর কান্নায় ভরে উঠছিল সারাটা বুক। তাড়াতাড়ি ওরা তাই ঢুকে পড়ল কেটলির মধ্যে। চোখ জুড়ে নামল গভীর ঘুম। তারপর ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে কখন এক সময় নীল-শিশি-মাছিদের দেশ ছাড়িয়ে ওরা চলে এল দূরে, বহু দূরে।

বলার মত কিছুই আর ঘটল না ক'দিন। নিরুপদ্রব যাত্রা। ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠছিল দিনগুলো। এমন সময় আবার হল এক মজার কাণ্ড। প্রায় ছ সাত শ ইয়া ইয়া দাঁড়াঅলা কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ির সঙ্গে মোলাকাত। জলের ধারে বসে তারা একটা প্রকাণ্ড বড় লাল পশমের গুলি নিয়ে তার জট খোলার চেষ্টা করছে। জট তো খুলছেই না, বরং আরও পাকিয়ে যাচ্ছে। তিতিবিরক্ত হয়ে ওরা মাঝে মাঝে পশমের গোলাটাকে তাই গোলাপ জলে আর শাদা দুধের ফেনায় চুবিয়ে নিচ্ছে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে চার মূর্তি তো হতভম্ব।

কিছুক্ষণ পর ওরা আর চুপ করে থাকতে পারল না। খুব মোলায়েম করে জিগ্যেস করল, ও ভাই কাঁকড়া আর চিংড়ি বন্ধুরা, আমরা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি ?

কাঁকড়াদের সর্দার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, তাহলে তো খুব ভালোই হয়। আমরা কয়েকটা পশমের দস্তানা করতে চাই। কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানো, আসলে আমরা কেউই জানি না কী করে দস্তানা করতে হয়।

দস্তানা তৈরির ওস্তাদ কারিগর বেগুনি। সে অমনি লাফিয়ে উঠল। বলল, এই কথা! এর জন্যে তোমাদের এতটুকু ভাবনা নেই। আচ্ছা ভাই, তোমাদের ওই দাঁড়াগুলো খোলা যায়, নাকি একেবারে জোড়া?

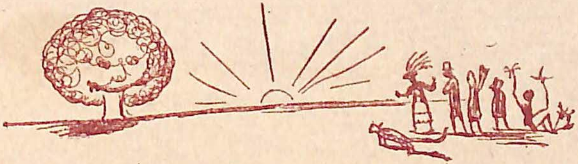
সর্দার কাঁকড়া বললে, জোড়া! না, না, খোলা যায়। সবগুলোই খোলা যায়।

বলে কাঁকড়ারা দাঁড়াগুলো খুলে বাড়িয়ে ধরল নৌকোর দিকে।

বেগুনি অমনি চট করে সেই দাঁড়ার ফাঁকে আটকে প্রথমে পশমের জটগুলোকে খুলে ফেলল। তারপর ঝটপট বুনে ফেলল অনেকগুলো দস্তানা। এত কম সময়ে এমন সুন্দর দস্তানা তৈরি করতে দেখে কাঁকড়ারা তো থ! ভারী খুশি ওরা দস্তানা পেয়ে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সব, তারপর পাখির মত নরম গলায় গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

চলেছে আমাদের ক্ষুদে অভিযাত্রীরাও। অভিজ্ঞতা জমছে তাদের ঝুলিতে। বিশ্বভ্রমণ বলে কথা! ছেলেখেলা নয়ত ব্যাপারটা! এবার কী হতে পারে আন্দাজ করো তো! কিছুতেই পারবে না, বাজি ফেলে বলতে পারি।

এবার এলো ওরা অদ্ভুত চেহারার একটা দ্বীপে, প্রকাণ্ড দ্বীপ, প্রথমে কিছুই নজরে পড়ল না। ওরা হাঁটতে লাগল সেই দ্বীপে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল অনেক দূর। তারপর হঠাৎ নজরে সেই জিনিসটা। দেখেই থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ

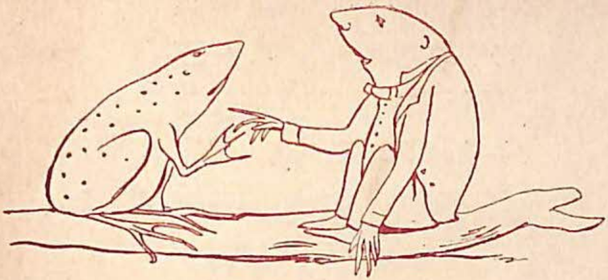




মজা দেখো লোকটার ইয়া বড়ো নাক
বজরায় চ'ড়ে ঘোরে কেমন চালাক!
বাতি রেখে নাকটাতে
মাছ সে যে ধ'রে রাতে
কোন কাজে নেই তার এতোটুকু ফাঁক।

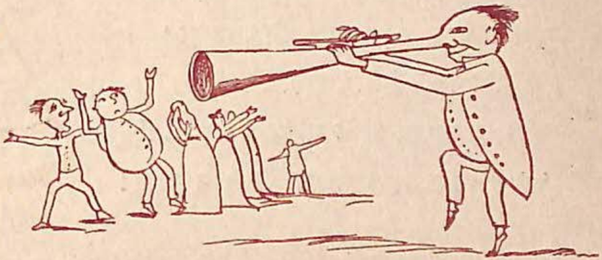


পাগলাটে বুড়ো বলে, 'কুছ নেই হরজা
কচ্ছপ তুই ভাই ধীরে ধীরে ঘর যা!
কোনারকে পিঠে ক'রে
আরামসে যাবো চ'ড়ে,'
ব'লে বুড়ো গান ধরে খাপছাড়া তরজা।



সেই যে বুড়ো বাস করতো কাদার মাঝে
নিষ্কর্মা স্বভাবটা তার ভীষণ বাজে !
খুঁটির ওপর ব'সে প'ড়ে
শোনাতো গান ব্যাঙকে ধ'রে
এবং করতো জ্ঞান বিতরণ সকাল-সাঁঝে !

নাক কি হেলাফেলার জিনিস, নাক দিয়ে যায় চেনা
বাঁশির মতো নাকটি যাহার তারে চেনে কে না ?
যেই বাজে নাক উচ্চসুরে
হুলুস্থুলু শহর জুড়ে
থমকে দাঁড়ায় স্তম্ভিত লোক, বন্ধ বেচা-কেনা !



ধরে দেখেও ঠিক বোঝা গেল না বস্তুটা কী! মনে হল একজন লোক মস্ত বড় একটা শাদা রঙের টুপি মাথায় দিয়ে চেয়ারে বসে আছে। সেই চেয়ারটা নরম কেক আর শামুকের খোলা দিয়ে তৈরি।

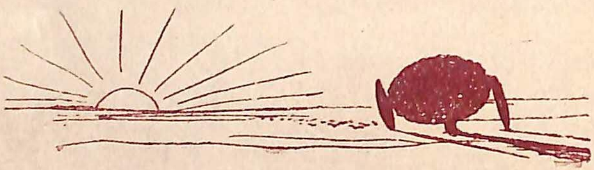
বেগুনি বললে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা কোন মানুষ নয়।

শুনে সবাই আর একবার ভালো করে সেদিকে দৃষ্টি দিল। কিন্তু লাভ হল না কিছুই; রহস্যের কোন কিনারাই করা গেল না।

ওদের ভেতর হাট্টিমা-টিম-টিম এর আগে বার কয়েক পৃথিবী ঘুরে এসেছিল। কাজেই তার জ্ঞানগম্যি অনেকটা বেশি। সে হঠাৎ চিৎকার করে বললে, আরে দূর-দূর, ওটা নিশ্চয় একটা বারোয়ারি ফুলকপি।

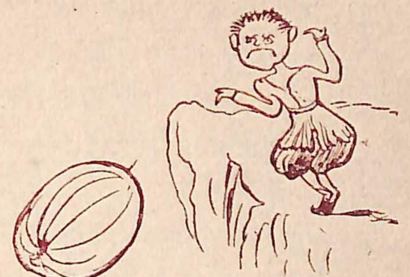
বারোয়ারি ফুলকপি! সে আবার কোন জন্তু রে বাবা! পরখ করে দেখার জন্যে ওরা এক দৌড়ে তার কাছে গেল। হ্যাঁ, ঠিকই—কোন মানুষ নয়, একটা বিরাট ফুলকপি। এতক্ষণ যেটাকে শাদা টুপি বলে মনে হচ্ছিল সেটা ফুলকপিটার মাথা। ওর কোন পা নেই; কিন্তু বাঁধাকপির একটা ডাঁটায় তালে তালে ওর দোল খাওয়া দেখে ভাবা যাচ্ছিল ও বুঝি খুব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, আর বাঁধাকপির ডাঁটায় ঢাকা পড়ে ওর জুতো মোজার খরচটাও বেমালুম বেঁচে যাচ্ছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে নৌকোয় ফিরে ওরা সেই অদ্ভুত কপিটাকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আরে, আরে—ওটা যে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠছে! তালকানা একটা লোকের মতন দুটো শশার ওপর আরামে ভর করে ছুটছে দেখি ডুবন্ত সূর্যের দিকে। আর তিনটে করে সারি বেঁধে একদল কাদাখোচা পাখি চলেছে ওর পিছু পিছু। ঐ যাঃ, ওরা মিলিয়ে গেল পশ্চিম দিগন্তের ধুলো বালির মেঘের আড়ালে।



তাজ্জব এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্ষুদে অভিযাত্রীদের ভীষণ খিদে পেয়ে গেল। এই সব মজার জিনিস দেখা কম পরিশ্রমের কাজ নাকি!

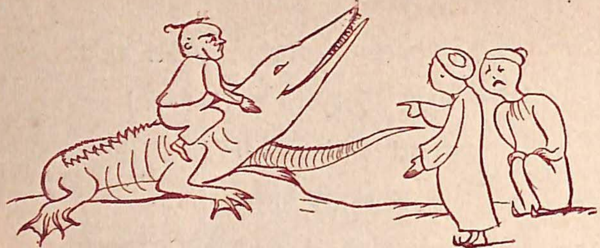
যাক গে, এর কিছুদিন পরের ঘটনা বলি।



ওরা তখন একটা ঝুলন্ত পাহাড়ের নিচে পৌঁছেছে। ছোট একটুকরো একটা পাহাড়। তার ওপরে দাঁড়িয়েছিল কিম্ভুত বিচ্ছিরি চেহারার একটা ছেলে। গোলাপী রঙের জামা গায়ে, মাথায় একখানা দস্তার থালা। কোথাও কিছু নেই ছেলেটা দুম করে এ্যাব্বড় এক কুমড়ো ছুঁড়ে দিল নৌকোটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নৌকো একেবারে কাত! পুরো উল্টে গেল সেটা!

তাতে অবশ্য ওদের তেমন ক্ষতি হল না। সাঁতার ওরা খুব ভালো জানতো। আর এভাবে সাঁতার কাটতে পেয়ে ওদের বরং ভালোই লাগল। চাঁদ না-ওঠা পর্যন্ত ওরা এমনি সাঁতার চালিয়ে গেল। তারপর একটু শীত-শীত করতে উঠে পড়ল নৌকোয়। উঠে বেশ করে গা-হাত-পা মুছে ফেলল। এদিকে হাট্টিমা-টিম-টিম করেছে কী, ঠেলতে ঠেলতে কুমড়োটাকে জোরসে পাহাড়টার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়টা আসলে ছিল চকমকি পাথরে বোঝাই। কুমড়োর ধাক্কা খেতেই চকমকিগুলো জ্বলে উঠল। গোলাপী জামার বিচ্ছিরি-মার্কা সেই ছেলেটা তখনও বসেছিল পাহাড়ের ওপর। প্রথমে আগুনটা সে দেখতে পায় নি—গায়ে গরম আঁচ লাগতে তাকিয়ে দেখে, ওরে বাব্বা! চারদিক দাউ-দাউ করে জ্বলছে। পালাবার কোন পথই নেই। বেচারীর অমন সাধের জামাটা গেল পুড়ে, নাকটাও গেল বেগুনপোড়া হয়ে।

এরপর বাধল আরেক ঝামেলা। সেটা অবশ্য আরেক জায়গায়। সেখানে কিছুই নেই—কেবল বড় বড় কয়েকটা খাদ। আর খাদগুলো বোঝাই তুঁতফলের আচার। এই খাদের মালিক হলদে নাকঅলা বাঁদর। এক-আধটা নয়, অমন হাজার হাজার বাঁদর সেখানে বাস করে। শীতকালের খাবার হিসেবে তারা ওই তুঁতফল একটা জায়গায় জড়ো করে রাখে। প্রচুর



কুমীরের পিঠে যেই চড়েছে বামন
পড়শীরা দেখে বলে, 'মশাই থামুন,
বোঝেন না হাবেভাবে
রাত্তিরে ছিঁড়ে খাবে!
ও ব্যাটার পিঠ থেকে জলদি নামুন!'

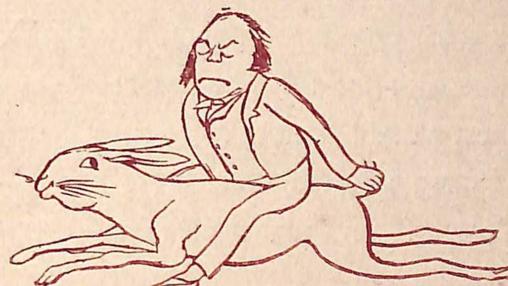
প্রাগের বুড়িটা ছিলো বিদঘুটে চেহারা
কথার ধরন তার আজগুবি বেয়াড়া!
যদি কেউ টুপি জোড়া দেখিয়ে
বলে তারে, 'টুপি নাকি এ কি এ!'
'হ'তে পারে, নাও পারে,' উত্তর এ ধারা!





আজব ছাড়া বলব কি আর তাহারে
যখন বসে আজগুবি সে আহারে
রোস্ট চাইতো মাকড়সার
চাটনি এবং তাইতো তার
সত্যি ছবি সাগর জলের বাহারে!

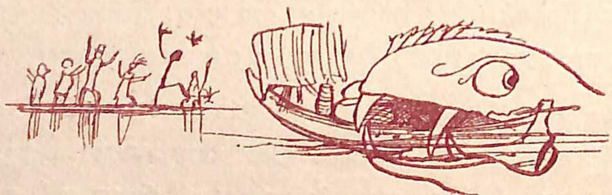
বুড়ো ভীষণ মনে মনে নিরাশ হ'য়ে
আনলো কিনে খরগোস এক বাড়ি ব'য়ে!
একদিন সে খরগোসটার
পিঠেই চ'ড়ে বেরিয়ে তার
নিরাশ হওয়া মনের মধ্যে গেলো স'য়ে!



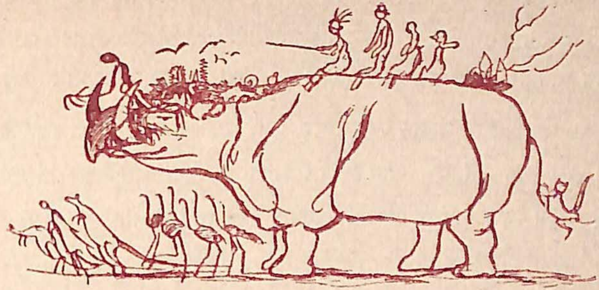
সোনামুখী লতাও সেখানে জন্মায়। তুঁতফল এবং সেই সোনামুখী লতা দিয়ে বাঁদরগুলো চমৎকার খাবার তৈরি করতে পারে। সে খাবার একবার খেলে তার স্বাদ সারা জীবন ভোলা যায় না।

যাই হোক, ওরা যখন পৌঁছুল তখন একটিমাত্র বাঁদর সেখানে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম বলে ঘুম--এমন বিচ্ছিরি সুরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে তার নাক ডাকছিল যে চার মূর্তি আর তাদের দুই সঙ্গীর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার দাখিল। সেই বিটকেল, বিদঘুটে আওয়াজে ভয় পেয়ে কোন রকমে মাত্র এককৌটো তুঁতফল নিয়েই ওরা ভোঁ দৌড়।

কিন্তু নৌকোয় ফিরতে গিয়ে চক্ষু ছানাবড়া। নৌকোটার পাত্তাই নেই। মাঠাতোলা ব'য়েম আর কেটলিসমেত পুরো নৌকোটাকেই গিলে বসে আছে বিরাট এক তিমিঙ্গিল। কী ভয়ঙ্কর চেহারা সেই তিমিঙ্গিলের! তাকালেই ভয়ে দেহের রক্ত জমে আইসক্রীম হয়ে যায়। এতখানি পথ তারা এসেছে, এমন একটা বিকট জীব এর আগে নজরে পড়ে নি। ওদের অমন সাধের নৌকোটাকে তিমিঙ্গিল তখন তার পঞ্চান্ন লক্ষ কোটি দাঁতের ফাঁকে কড়মড় করে চিবুচ্ছিল। দেখে হাতুড়ি-পেটা, খড়ের-সং, সিংহের-গো আর বেগুনির দারুণ কান্না পেল। হায় রে! পৃথিবী ঘোরা ওদের খতম। এখন অগামারা এই জায়গায় পচে মরতে হবে বাকী জীবনটা।



কখনই না। ওরা ঠিক করল, নৌকো গেছে কুছ-পরোয়া নেই। এবার হাঁটাপথে শুরু করবে অভিযান। পায়ে হেঁটেই এগোতে যাচ্ছিল এমন সময় এক বুড়ো গণ্ডারকে সেখান দিয়ে যেতে দেখা গেল। ব্যাস, চটপট গিয়ে ওরা সেই গণ্ডারের পিঠে চেপে বসল। চারজনের বেশি জায়গা হয় না সেখানে-- কাজেই হাট্টিমা-টিম-টিম গণ্ডারের কান ধরে তার শিংয়ের ওপর গিয়ে চড়ল। আর পুষি বেড়াল? সে ঝুলে পড়ল গণ্ডারের লেজ ধরে। দিব্যি দোল খেতে খেতে মজাসে চলল পুষি বেড়াল।



বাহন তো জুটল, কিন্তু খাবার? ওদের কাছে মাত্র চারটে ছোট বরবটি আর সামান্য কিছু আলু ছিল--তাই দিয়ে তো আর পুরো পথটা চলবে না। ভাগ্যের চাকা যখন ঘোরে তখন কোন কিছুতেই আটকায় না। খাবারের জন্যে ওদেরও আটকাল না।

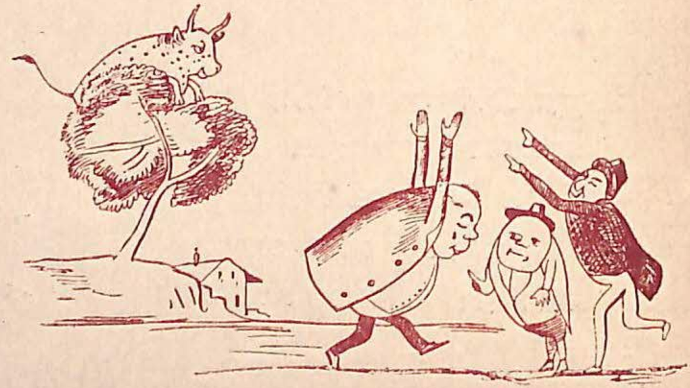
গণ্ডারের পিঠে একটা রডোড্রেনডন গাছ গজিয়েছিল, তার বীজ খেতে উড়ে আসত রাশি রাশি মোরগ আর চীনে মুরগি, নাম-না-জানা অজস্র পাখ্-পাখালি। ওরা তাদের ইচ্ছেমত খপাখপ ধরত এবং ঝটপট রান্না করে ফেলত। না, না, রান্নার জন্যেও কোন চিন্তা ছিল না। গণ্ডারের পিঠে বসে বসেই তা দিব্যি করা যেত। কেননা ওর পিঠে একটা জলন্ত উনুনও ছিল আগে থেকেই।

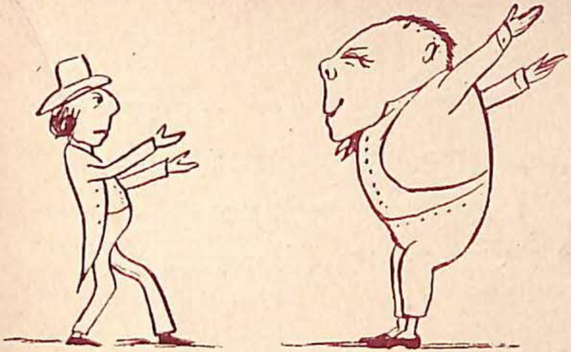
আস্তে আস্তে একদল ক্যাঙ্গারু আর বিরাট বিরাট অনেকগুলো সারস পাখি ওদের সঙ্গী হয়ে গেল। একা একা চলার দুর্ভাবনাও মোটে রইল না। রীতিমতন শোভাযাত্রা করেই এগিয়ে চলল ওদের মিছিল।



সুন্দরী ওই দেখো মেমের, দেখো কাণ্ডখানা
চিবুকটাকে ক'রলো বিরাট লম্বা ছুঁচলো পানা।
রাত-বিরেতে দুপুর দিনে
তারের তৈরি বাজনা কিনে
আপন মনে অবাক-করা সুর বাজালো নানা।

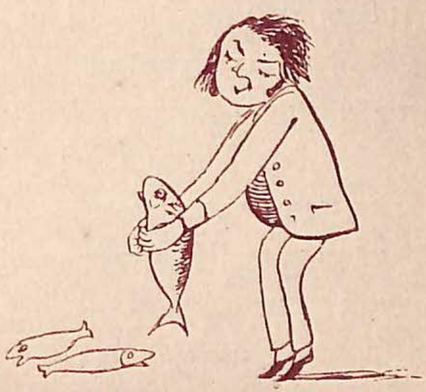
মস্ত একটা বলদ ছিলো লোকটার
হারিয়ে তাকে উথলে ওঠে শোক তার!
ডেকে দেখায় পথের লোকে,
'গাছের মাথায় দাঁড়িয়ে ও কে?
এই বয়েসেই খেলে মাথা চোখটার!





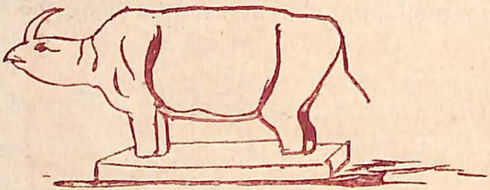
সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো দূর নাসিক
ব'ললো শুধু, 'টিক-এ-টিক, টিক-এ-টিক;
চিকা-বী, চিকা-বা,'
আর তো মুখে কাটলো না রা
পাগলা বুড়ো, নয়কো জেনো দার্শনিক!

সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো চিতোরগড়ে
মাছকে হাঁটা শেখাতে সে চেষ্টা করে!
প'ড়লে টলে মাছরা ম'রে
ব্যগ্র হ'য়ে ব'ললো, 'ওরে,
ফেরার সময় হ'লো এবার ফিরবো ঘরে!'



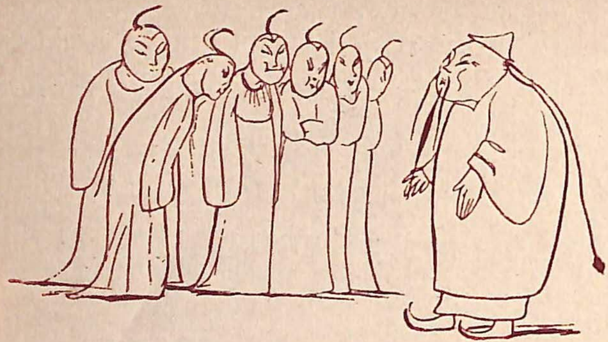
চলতে চলতে আঠারো সপ্তার আগেই ওরা নিরাপদে ফিরে এল দেশে। দেশের লোক ওদের ফিরে পেয়ে খুব খুশি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এসে আনন্দে জড়িয়ে ধরল ওদের। এবং তখুনি ওরা ঠিক করল, খুব শিগ্‌গীরই ফের বেরিয়ে পড়বে বাদবাকী জায়গাগুলো দেখতে। পৃথিবী ঘোরার মতন এমন মজা আর দুটি নেই।

ও, হ্যাঁ, আসল কথাই তো বলতে ভুলে যাচ্ছি। সেই বুড়ো গণ্ডারটা, যার দৌলতে ওদের যাত্রা শেষ অবধি অতো আরামের হয়েছিল, তার কী হল জান? সে মারা যাওয়ার পর তার চামড়া দিয়ে ওরা একটা খড়ের পুতুল বানিয়ে বাইরের ঘরে স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি পাপোশের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল--ওদের আজব ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।





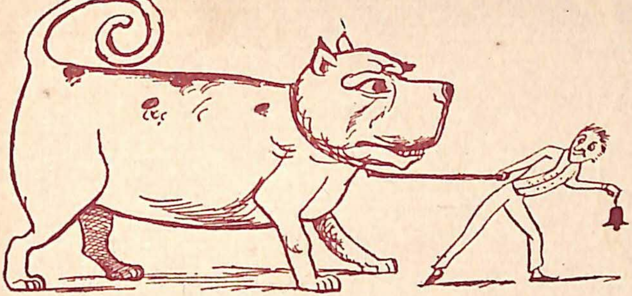
জাম্বলিগুলোর সবজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি



ঐ বুড়োটার আদি নিবাস চীন দেশে
ছয় মেয়ে তার ঘুরে এলো তিন দেশে।
পদ্ম, বেলি, কালীতারা,
খেঁদি, বুঁচি, লালী তারা
তাদের বাড়ি গ'ড়বে কি আর ভিন দেশে!

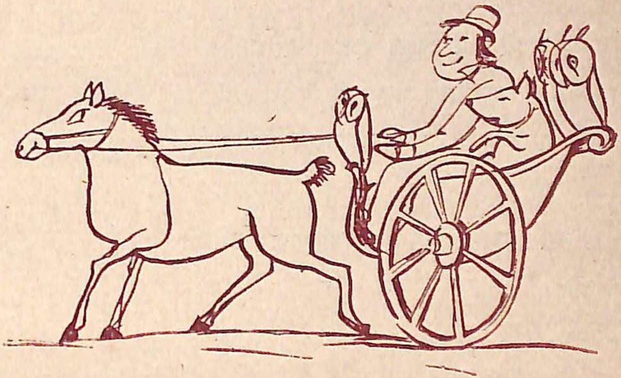
বুড়ো ছিলো ভালো লোক
চেস্টারবাসী গো
ছোকরারা তবু তার
পিছে লাগে আসি গো!
ইয়া বড়ো পাথরের ঘায়েতে
রইলো না হাড়গোড় গায়েতে
চেস্টার ছেড়ে শেষে
ছুটে যায় ঝাঁসি গো!





সেই বুড়োটা থাকতো যে গো হস্তিনাপুর
মালিকবিহীন পেয়ে সে এক ছোট্ট কুকুর!
শহরেতে তাকে নিয়ে
ঘুরলো নানা রাস্তা দিয়ে
ব্যস্ত হয়ে হনহনিয়ে সারা দুপুর!

সেই যে বুড়ো থাকতো সে তো ঘুম-পাহাড়ে
মহৎ চিন্তা করতো না সে একেবারে!
চ'ললো ছোট এক্কা চ'ড়ে
তিনটে পেঁচা, শুয়োর ধ'রে
শহরবাসী চক্ষু ভেজায় অশ্রুধারে!

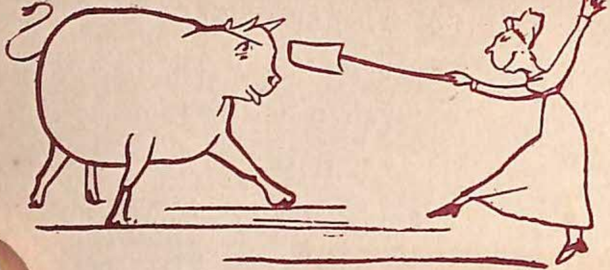


গেঁজলা দিয়ে বানিয়ে পুলি-পিঠে
ওদেরকে সব ভোজ খাইয়ে মিঠে
ব'ললো ওরা, 'আমাদেরও তবে
চিচিংফাঁকের গুহায় থাকতে হবে,
দেখতে হবে ফাটিংটিঙের ডেরা ;
ঘুরবো এবার এধার-ওধার
বন-জঙ্গল উথাল-পাথাল খাঁড়ি। '
জাম্বলিগুলোর সবুজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি।



ডং চলেছে সঙ্গে নিয়ে জ্বলজ্বলে তার নাক

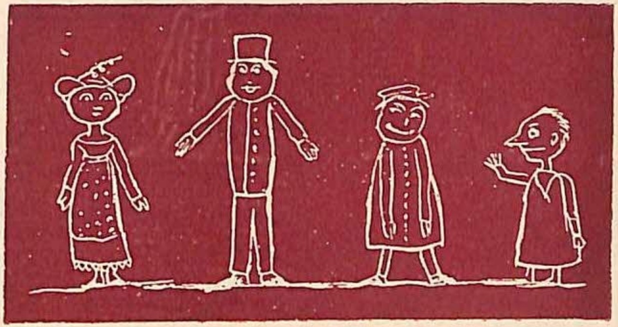
শীতকালেতে রাত হ'য়েছে যখন মস্ত বড়ো
গ্রাম্বুলিয়ার রাজ্যে তখন হ'চ্ছে কেবল জড়ো
চুপিসাড়ে ঘুটঘুটিয়া, আঁধার যতো এসে
পাহাড়িয়া সাগর-তীরের কোলে
ঢেউ আছড়ে বিকট আওয়াজ তোলে
চিচিংফাঁকের গুহার পাহাড় এক্কেবারে ঘেঁষে
ছড়িয়ে-পড়া ঈশানী মেঘ দোলে!



চিংড়িপোতার বুড়িকে সোমবারে
করলো তাড়া হঠাৎ কেঁদো ষাঁড়ে।
খোন্তাটাকে বাগিয়ে ধ'রে
'মাভৈঃ!' বুড়ি চেঁচায় জোরে
পালিয়ে গেলো ষাঁড় তো দেখে তারে!



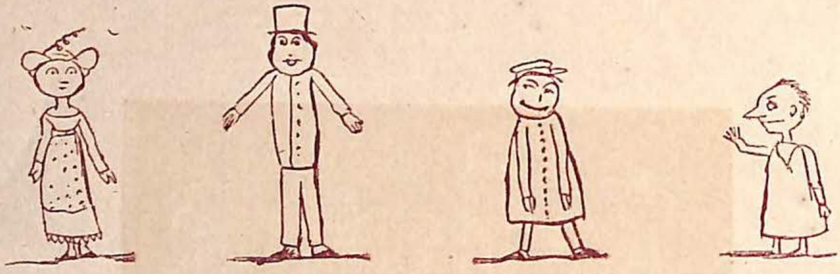
সত্যিই এই মেয়ে তুলনাবিহীন
দিব্যি ব'য়েমে ব'সে কাটালো যে দিন!
মাখালো সবুজ রঙ তার গায়
সব লোক যাতে সেদিকে তাকায়
শান্ত মেয়ে কি হবে ব'য়েমেই লীন?



মনের আনন্দে ভাসতে ভাসতে চলেছে। ......
পৃথিবী ঘোরার মতন এমন মজা আর দুটি নেই।

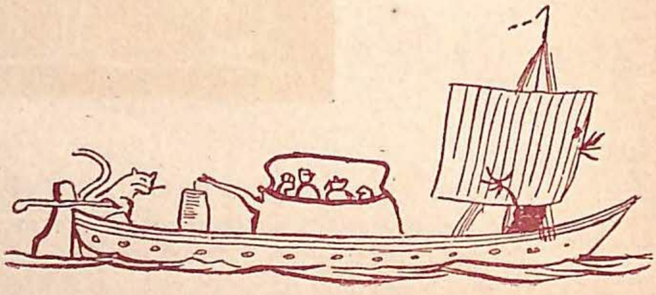
সে কি আজকের কথা নাকি! দেখতে দেখতে কতোদিন হয়ে গেল।

সেই আদ্যিকালে এক দেশে থাকত তিন ভাই আর এক বোন। তাদের নাম--



বেগুনি হাতুড়ি-পেটা খড়ের-সং আর সিংহের-পো

যেমনি তাদের নামের বাহার, তেমনি বুদ্ধির বহর। চার মুণ্ডু এক করে একদিন তারা ঠিক করল, পৃথিবী ঘুরতে বেরুবে। সামনের সমুদ্দুর থেকে রওনা হয়ে সারা দুনিয়া পাক দিয়ে দেশের পেছনের সমুদ্দুরে এসে হাজির হবে।

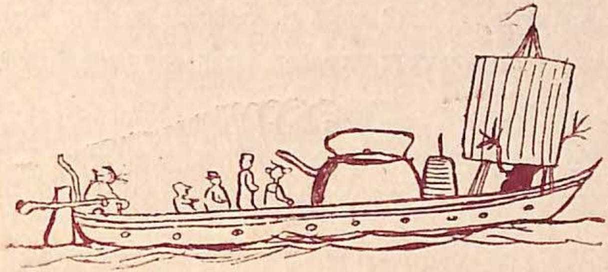


যেই-না ভাবা অমনি শুরু হল তোড়জোড়। বিরাট একটা পালতোলা নৌকো কিনে ফেলল। তার সর্বাঙ্গে লাগাল নীল রং আর মাঝে মাঝে সবুজ রংয়ের বুটি।

পালখানাকে করল হলদে-লালে ডোরাকাটা। এই যাত্রায় সঙ্গী নিল ওরা আরও দুজনকে। একজন হল পুষি বেড়াল--সে ওদের নৌকোর হাল ধরবে, নৌকোটাকে দেখাশোনা করবে; অন্যজন বুড়ো হাট্টিমা-টিম-টিম--খাবার-দাবার রান্না করবে, চা-জলখাবারের ব্যবস্থা দেখবে। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা কেটলিও তোলা হল নৌকোয়।



প্রথম দশটা দিন তাদের তোফা আরামে কেটে গেল। সমুদ্দুরে কিলবিল করছে অজস্র মাছ। লম্বা চামচে করে তুলে দেওয়ামাত্র হাট্টিমা-টিম-টিম সুন্দর করে রেঁধে দিচ্ছিল। পুষি বেড়াল তো সেই মাছের এঁটোকাঁটা খেয়েই খুশিতে ডগমগ। মনের আনন্দে ওরা ভাসতে ভাসতে চলেছে।



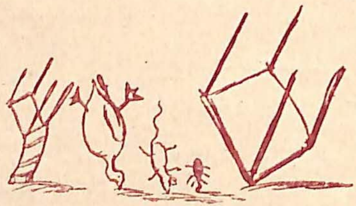


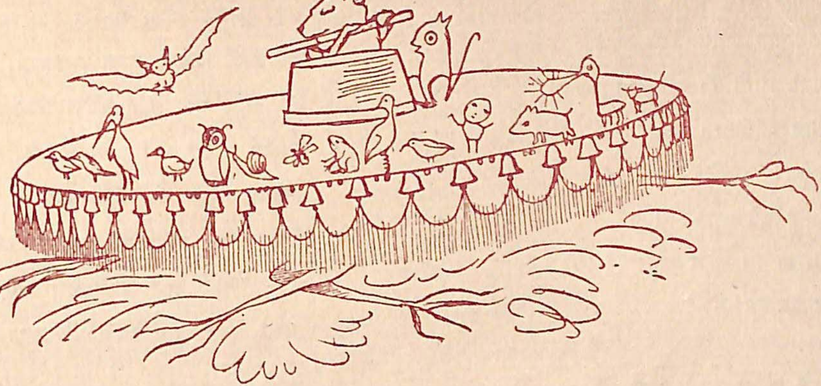
তারপরে ধীরে ধীরে শহরের পথে
দুই জনে বের হ'লো প্রায় কোন মতে।
এইভাবে যতো দূরে হেঁটে যায় তারা
যারা দেখে ফুর্তিতে তারা মাতোয়ারা।
দ্রুত পায়ে ছুটে ওরা কাছে চ'লে আসে
চিৎকার ক'রে বলে, 'মুক্ত বাতাসে
নিঃশ্বাস নিতে পথে হেঁটে চ'লে যায়
টেবিল চেয়ার দেখো গুটি গুটি পায়।'

শহরের পথ ছেড়ে ওরা অবশেষে
থেমে গেলো কেল্লার একধার ঘেঁষে!
উপত্যকার মাঝে পথ গেছে মিশে
যেখানে পায় না ওরা খুঁজে কোন দিশে!
খুঁজতে খুঁজতে সারা দিন কেটে যায়
গুবরে, হাঁসের ছানা, ইঁদুর সহায়

হ'য়ে ফের পথ চিনে নিয়ে আসে ঘরে;
চেয়ার টেবিল ডাকে পরম আদরে।

সেই সব ছোট সোনা সাথীদের সাথে
ভ্রমণের গল্পেতে খুশি হ'য়ে মাতে।
গল্পের শেষে আসে পায়েস ও পিঠে
পেট-পুরে ভোজ চলে আরও মিঠে মিঠে।
এবারে খাবার আসে মাংস ও সব্জী
ওরা খায় আনন্দে ডুবিয়ে তো কব্জি।
পাঁশুটে ইঁদুর আর হাঁসেদের ছানা
ছোট গুবরে মিলে মজা করে নানা।
মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা ধেই ধেই নাচে
তারপরে বিছানায় শুয়ে পড়ে বাঁচে!



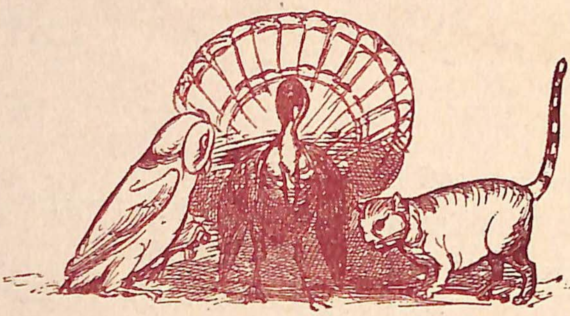


হাট্টিমাটিমটিমের টুপি

পিঠে দিয়ে গড়া এক ইয়া বড় গাছে
হাট্টিমাটিমটিম গিয়ে বসে জাঁক ক'রে,
টুপি তার আঁটা আছে অদ্ভুত ধাঁচে
মুখখানি যাতে গেছে পুরো ঢাকা প'ড়ে।
একশ' দু' ফুট ছিলো টুপি চওড়ায়
ঝালর ঝোলানো ছিলো তারি চারধারে
ফুটো ছিলো, ফিতে ছিলো আর ছিলো তায়
ঘন্টা, বোতাম বহু—দেখিতে না পারে
যাতে কেউ হাট্টিমাটিমটিম---

হাট্টিমাটিমটিম বলে নিজেকেই নিজে,
'পিঠে গাছে চ'ড়ে আমি আছি বেশ খাশা!
জ্যাম আর, জেলি আর, রুটি পেলে কি যে
ভালো লাগে—জানাবার নেই কোন ভাষা!
তথাপি এটাও ঠিক, যতদিন আছি
পিঠে গাছে চ'ড়ে, জানি অন্যেরা হায়
আসে না আগের মতো মোর কাছাকাছি,
হুল্লোড়ে দিনগুলো পালালো কোথায়!'
দুঃখিত বলে হাট্টিমাটিমটিম---

'প্রিয় শুয়োর, ক'রবে কি হায় আংটি বিক্রি এক পয়সায় ?'
শুনে শুয়োর ব'ললো, 'রাজি আছি।'
তখন তারা আংটি নিয়ে পরের দিনই ক'রলো বিয়ে
চীনে-মুরগীর বাড়ির কাছাকাছি।
নৈশভোজে লেবুর চাকা এবং বড়া মাংসে মাখা
হাতায় তুলে আহার ক'রলো সারা
বালির পাড়ে গিয়ে রাতে হাত ধ'রে দুই হাতে হাতে
কাক-জোছনায় নাচ জুড়লো তারা।



জুড়লো তারা
জুড়লো তারা
কাক-জোছনায় নাচ জুড়লো তারা।

ইস্টিশানের মিষ্টি সুর

ইস্টিশানের মিষ্টি সুর
চ'ললো ভেসে ভর-দুপুর।

কাপাস গাছের পাতায়
নীলচে পাখার হাজার পাখি
সারা আকাশ মাতায়।

গাছকে ঘিরে উড়ে উড়ে
গান গেয়ে যায় নানান সুরে
সে-সব সুরে রাখছে ধ'রে
কেই বা গানের খাতায়!

উড়তে উড়তে হাজার পাখি পার
ফিরলো না কেউ আর
ফিরলো না কেউ
ফিরলো না কেউ
ফিরলো না কেউ আর!

ইস্টিশানের মিষ্টি সুর
চ'ললো ভেসে সমুদ্দুর।

ছোট্ট মাছের বাচ্চা এলো সাঁতরে
দুধের সাগর পার হ'য়ে



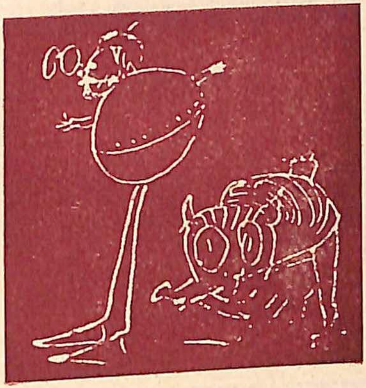
পিঠে গাছে একদিন উড়ে এলো শেষে
গায়ক ক্যানারি পাখি, বউ তারি সনে ;
'ভারি মজা পেয়ে গেছি এইখানে এসে
এমন জায়গা আহা, দেখি নি জীবনে !
তোমার টুপির পরে আমাদের বাসা,'
বলে, 'যদি বানাবার অনুমতি পাই
গ'ড়ে তুলি একখানা কী দারুণ খাশা ;
তোমারি মনের মতো সে বাসা সাজাই !
বলো ভাই হাট্টিমাটিমটিম ---'

তারপর পিঠে গাছে এলো ধীরে ধীরে
সারস, পেঁচক, হাঁস, ভোমরা, শামুক
প্যাঁচানো ঠ্যাঙের পাখি, ব্যাঙও গেলো ভিড়ে
সকলে গ'ড়তে বাসা সেথা উৎসুক !
'হাট্টিমাটিমটিম সোনা অনুরোধ রাখো,
চেয়ে দেখো কি ভাবে যে গ'ড়ি টুপিতেই
দেখবার মতো বাসা--টের পাবে নাকো
একবার অনুমতি তোমার পেলেই
শোন ভাই হাট্টিমাটিমটিম ---'

সোনালী জংলী হাঁস এলো সেথা ক্রমে
হতুমথুমোও এলো আঙুল তো নেই !
দৌড়োনো ভল্লুক এলো একদমে
ডং এলো নাক যার আজও জ্বলছেই !
নীলচে বেবুন এলো, যে বাজায় বাঁশি
উজ্জ্বল বাছুর আসে ট্যুট দেশ হ'তে
তেলাপোকা, বাদুড়েরা দলবেঁধে আসি
গ'ড়ে তোলে প্রিয় বাসা টুপির চুড়োতে।
ভারি ভালো হাট্টিমাটিমটিম ----

হাট্টিমাটিমটিম ফের নিজেকেই বলে,
'কি মিষ্টি শব্দের টুং-টাং ভাসে
এসব প্রাণীরা যবে ধীরে ধীরে চলে !'
তুঁতে-চাঁদ উঠেছিলো যখন আকাশে
সবুজ ছড়ানো পাতা সেই পিঠে গাছে
বেবুন বাজালো বাঁশি সুরেতে রঙিন
তাই শুনে সক্কলে দুলে দুলে নাচে
তাল ঠোকে খুশি মনে তাধিন তাধিন !
সকলের প্রিয়জন হাট্টিমাটিমটিম।

এবং



১৮৭০ সালের আগস্ট মাসের ননসেন্স গেজেট থেকে:
আমাদের পাঠকেরা বিশ্ববিখ্যাত উদ্ভিদবিদ অধ্যাপক ভোসের নিম্নলিখিত তথ্যপূর্ণ রচনাবলীতে আগ্রহ বোধ করিতে পারেন। প্রথম তিনটি প্রবন্ধে তিনি রন্ধন-বিষয়ক অতি উপাদেয় কথা লিখিয়াছেন, যাহা প্রতিটি পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয়। অতঃপর উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের নিকট চিত্তাকর্ষক ডাঃ ভোসের নবতম আবিষ্কার-সমূহের সচিত্র বিবরণ তাঁহারই সৌজন্যে আমাদের পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।



খুশির ডানায় দাঁড় ব'য়ে
সমুদ্দুরের মাছ দেখে সে
নাচলো হ'য়ে কাত্‌ রে
টুপি তুলে হেলে-দুলে
ক'রলো বাজীমাত্‌ রে।

তারপরেতে সে
ফিরলো না তো যে
ফিরলো না তো
ফিরলো না তো
ফিরলো না তো সে!

ইস্টিশানের মিষ্টি সুর
হাওয়ায় বাজায় তার নূপুর।

কুটুস-কুটুস ছোট্ট ইঁদুর
দৌড়ে এলো এদিক চেয়ে
হাওয়ায় চায়ের গন্ধ পেয়ে।

তাক ধুম ধুম তাক
শূন্য চায়ের কাপ।
শূন্য কাপে ব'সে তারা
উঠলো খুশির গান গেয়ে।

তারপরেতে তারা
কাঁদিয়ে সারা পাড়া
ফিরলো নাকো
ফিরলো নাকো
ফিরলো নাকো তারা।



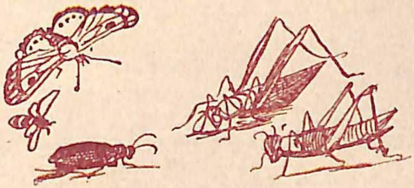
ইস্টিশানের মিষ্টি সুর
চ'ললো ভেসে অনেক দূর।

গুবরে-পোকা গঙ্গাফড়িং
সবার সেরা গুলবাগিচার
প্রজাপতির পাঙখা ধরিং।

উড়ে এসে মৌমাছি
যেই খেয়েছে ডিগবাজি

মাঠের মাঝে চতুর্দিকে
পটাস-পটাস শব্দ করিং।

তারপরেতে আর
খুঁজে পাওয়াই ভার
ফিরলো না কেউ
ফিরলো না কেউ
ফিরলো না কেউ আর।



লম্ব-হংস পিঠে তৈরি

চার পাউণ্ড (মানে সাড়ে চার পাউণ্ড আর কি) খুব টাটকা দেখে লম্বহংস নাও, তারপর ছোট্ট দেখে একটা মাটির পাত্রে রাখো।

এবারে জল ঢেলে সেটা ডুবিয়ে দাও, তারপর আট ঘন্টা ধ'রে ফোটাও আর ফোটাও। চার ঘন্টা ফোটাবার পরে যখন মনে হবে যে লম্বহংস বেশ নরম হয়ে গেছে, তখন তা নামিয়ে এনে বড় একটা পাত্রে রাখো। হ্যাঁ, ভালো ক'রে নজর রেখো যেন সেটা ঠিকমত ঝাঁকানো হয়।

ক'টা জায়ফল গুঁড়ো ক'রে তার ওপরে ছড়িয়ে দাও, তারপর আদাপিঠে, কারী পাউডার আর প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ দিয়ে তার ওপরে পুরু প্রলেপ লাগিয়ে দাও। এবারে পাত্তরটাকে ধ'রে পাশের ঘরের মেঝেয় ঠকাস্ ক'রে নামিয়ে রাখো। ফের আগের ঘরে নিয়ে এসে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধ'রে সেদ্ধ হ'তে দাও। এবারে পাত্তরটা ধ'রে জোরে জোরে নাড়া দিতে থাকো, যতক্ষণ লম্বহংসের রং হালকা বেগুনী না হয়।

পুরের জিনিসটা কাদার মত নরম হয়ে গেলে তাতে একটা ছোট্ট পায়রা, দু' টুকরো গো-মাংস, চারটে ফুলকপি আর যতগুলো পারো শামুক ধীরে ধীরে একসঙ্গে মিলিয়ে দাও। ভালো ক'রে দেখো ওপরের গর্দা পড়তে শুরু করেছে, তারপর মাঝে মাঝেই একটিপ ক'রে নুন ছিটিয়ে দাও।

এবারে তৈরি হ'য়ে গেল লম্বহংস পিঠে। পরিষ্কার প্লেটে সাজিয়ে সকলকে পরিবেশন করো। এমন মজাদার খাবার একেবারে চেটেপুটে—না, মুখে দেবার

আগেই যত তাড়াতাড়ি পারো প্লেটশুদ্ধু খাবারটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে বাঁচো। বাপস্!

বিচূর্ণিত কাটলেট তৈরি

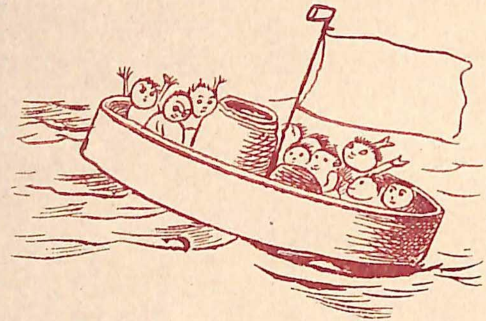
ক'টা লম্বা লম্বা ফালির মাংস জোগাড় করো। এবারে যতদূর সম্ভব ছোট ছোট ক'রে সেগুলো টুকরো করো। সেই টুকরোগুলোকেই এরপর আট / নয় ভাগে কাটো।

এগুলো যখন পাওয়া গেল তখন কাপড়ের তৈরি একটা ব্রাশ নিয়ে চটপট ঝেড়ে নাও। তারপর একটা নুনের চামচে কিংবা ঝোলের হাতা দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি চারিদিকে ঘুঁটতে থাকো।

পুরোটাকে একটা সসপ্যানে ঢেলে রোদ্দুরে রাখো। (ছাদে যদি চড়াই বা ঐ জাতীয় অন্য কোন পাখির উৎপাত না থাকে তাহ'লে ছাদে মেলে দেওয়াই ভালো।) ঐ অবস্থায় হপ্তাখানেক রেখে দাও।

হপ্তা কেটে গেলে একটু ল্যাভেণ্ডার, কিছুটা বাদাম তেল, হেরিং মাছের কয়েকটা কাঁটা ভালো ক'রে মিশিয়ে নিয়ে চার গ্যালন পরিশ্রুত ব্রাসকোবোলিয়াসের চাটনিতে চুবিয়ে রাখো। ব্যাস, জিনিসটা তৈরি হ'য়ে গেল, বাকী শুধু কেটে-কুটে কাটলেটের ছাঁদে আনা।

এখন পরিষ্কার টেবিল ক্লথ কিংবা ডিনার ন্যাপকিনে সাজিয়ে সকলকে পরিবেশন করো।



জাম্বলিগুলো

১

সাগর বেয়ে ছাঁকনি চেপেই চ'ললো ওরা—সাগর বেয়ে
ছাঁকনি চেপেই চ'ললো তাড়াতাড়ি
শুনলো নাকো বন্ধুরা তো করলো মানা
হি-হি শীতে, হু-হু ঝড়ে সব একটানা
ভাসিয়ে দিলো ছাঁকনি আড়াআড়ি।

ঘুরতে ঘুরতে ছাঁকনি দোলে যখন
'ডুববে ওরা', চেঁচায় সবাই তখন।
ওরা হাঁকে, 'আমরা কি ভয় করি,
হোক না ছোট, হোক না ফুটো তরী
চোখ-রাঙানির আমরা কি ধার ধারি!'
শীতের ভোরে ছাঁকনি চ'ড়ে
চ'ললো সবাই গুটিয়ে পাততাড়ি।
জাম্বলিগুলোর সবুজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি।

২

তরতরিয়ে ছাঁকনি চেপে পাল উড়িয়ে, তরতরিয়ে
পাল উড়িয়ে চললো ছাঁকনি চেপে
তামাক-টানা পুঁচকে নলের মাস্তুলটার
সঙ্গে বাঁধা উড়ছে ওদের ভেল-পর্দার
পত্‌পতে এক সবুজেটে পাল কেঁপে!

মাংসের প্যাটিস তৈরি

তিন / চার বছরের একটা বাচ্চা শুয়োর নাও; তার পেছনের পা একটা খুঁটিতে শক্ত ক'রে বাঁধো। এখন তার নাগালের মধ্যে রাখো পাঁচ পাউণ্ড কিসমিস, তিন পাউণ্ড চিনি, দু' ঝুড়ি কড়াইশুটি, আঠারোটা পোড়া আখরোট, একটা মোমবাতি, ছ' টুকরি পালং শাক। যদি দেখো যে শুয়োরটা এগুলো আরামসে খাচ্ছে, তবে ক্রমাগতই জোগান দিয়ে যাও।

এবারে একটু ননী, কয়েক টুকরো পনির, চার দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ আর কালো পিনের একটা প্যাকেট জোগাড় করো। এগুলো একসঙ্গে লেই বানাও, আর একটা পরিষ্কার লিনেন কাপড়ে মেলে শুকুতে দাও। যতক্ষণ না লেইটা পুরোপুরি শুকিয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটা মস্ত ঝাড়নের হাতল দিয়ে শুয়োরটাকে বেধড়ক পেটাও। যদি সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে, তবে তাকে আরও পেটো।

লেইটাকে একবার দেখে এসো, আবার শুয়োরটাকে পেটাও। এইভাবে চলুক কয়েক দিন। ঐ সময়ের শেষে দেখো সবটাই রগরগে প্যাটিসে পরিণত হয় কিনা। যদি ততক্ষণও তা না হয়ে থাকে, তবে জেনো. আর কোনকালেই হবে না। এমতাবস্থায় শুয়োরটাকে ছেড়ে দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটাই খতম হ'লো ব'লে ধ'রে নিতে পারো।



যুগোপযোগী যুক্তিহীন-যুবক
শরীরের চেয়ে মাথা অনেক বড়।

ব'ললো সবাই দেখলো ওদের যারা,
'উল্টে শেষে প'ড়বে ওরা মারা
সারাটা পথ আকাশ আঁধার ছাওয়া
সইবে না দাঁড় অমন জোরে বাওয়া
বুঝছে না যে উঠছে হাওয়া ফেঁপে!
তড়বড়িয়ে হড়বড়িয়ে
যাচ্ছে তবু, এমন বোকার ধাড়ি!'
জাম্বলিগুলোর সবুজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি।

৩

ছাঁকনি বেয়ে কুলকুলিয়ে জল উঠলো, ছাঁকনি বেয়ে
জল উঠলো অথৈ সাগর হ'তে
তখন ওরা সমস্ত পা জুড়ে
জল বাঁচাতে রঙিন কাগজ মুড়ে
পায়ের ওপর পেরেক ঠুকে পোঁতে।

তারপরে সব বয়েমেতে ঢুকে
ব'ললো হেসে রাত কাটিয়ে সুখে,
'আকাশ আঁধার অনেকটা পথ বটে
তালাকানা নই, বুদ্ধি আছে ঘটে,
    ছাঁকনি যতোই ঘুরপাক দিক স্রোতে
    ব'লবে না কেউ উঠলেও ঢেউ
    আমরা সবাই আত্মহননকারী!'
জাম্বলিগুলোর সবুজে মাথা, নীলচে দু' হাত
    ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
    ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি।

৪

দেখলো যখন ভাসতে ভাসতে সমস্ত রাত, দেখলো যখন
    সূয্যিমামা নেই আকাশের গায়ে
তুলে তামার ঢোলকেতে তান
তখন সবাই চাঁদ-মাখানো গান
    শিস দিয়ে গায় ফুরফুরিয়া বায়ে,



Iতে Indian—মানে আমেরিকার আদিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ান

রেখা টানা রেজাই জড়ানো রেড-ইণ্ডিয়ান—উনি একটা বিরাটাকার রূপোর চামচেতে এক অপূর্ব খরগোস ধ'রেছিলেন।

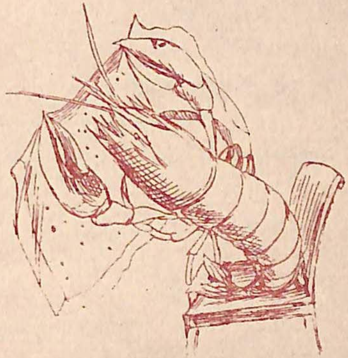


Jতে Jay—মানে ঝুঁটিঅলা একরকম পাখির নাম ঝকঝকে ঝলমলে ঝুঁটিঅলা পাখি—উনি গোলাপের মালা, তিনটে পালক আর সোনার কাঁটা দিয়ে ঘাড়ের ঝুঁটি সাজাতেন।



K তে Kangaroo—মানে ক্যাঙারু
ক্যাব্‌লা কেঁদো ক্যাঙারু—উনি ফিকে গোলাপী মসলিনের কাপড় প'রেছিলেন, তাতে আবার নীল-নীল বুটি দেওয়া।

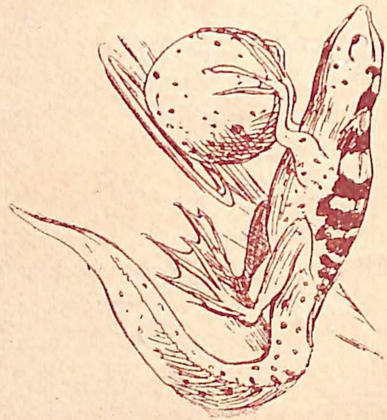
L এ Lobster—মানে গল্‌দা-চিংড়ি
গভীর গর্তের গল্‌দা-চিংড়ি—উনি নিজের কাপড় নিজেই ছুঁচ সুতো দিয়ে রিপু ক'রতেন।





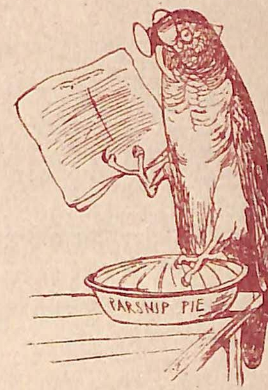
M এ Mouse––মানে নেংটি ইঁদুর
নেড়া নেংলা নেংটি ইঁদুর––উনি পিয়ানোতে একটা আধুনিক মিষ্টি সুর বাজিয়েছিলেন।

N এ Newt––মানে গো-সাপ
গোবেচারা গোবর-গণেশ গো-সাপ––উনি ওঁর নাতনির জন্যে একটা তালের মতন রসগোল্লা কিনেছিলেন।





O তে Ostrich--মানে উটপাখি
উদার উল্লসিত উটপাখি--উনি পা শুকনো
রাখার জন্যে উঁচু বুটজুতো প'রতেন।



P তে Parrot--মানে তোতাপাখি
তোষামুদে তোত্‌লা তোতাপাখি--উনি খবরের কাগজ
পড়েন আর চশমা চোখে দিয়ে গাজরের হালুয়া খান।

ধূ ধূ রাতের মাঠে তখন হঠাৎ আলোর গতি
অবাক-চোখে চমকে-দেয়া জ্বলন্ত এক জ্যোতি
ঝলমলানো রূপোতে তার ধবধবে রং গড়া
কয়লা-কালো রাতের বুকে একা
উল্কা যেন ঝরা-আলোয় লেখা
এপার থেকে ওপারে তার হঠাৎ আকুল করা
আলোর একটা বাপ্‌ কী ভীষণ রেখা!

চ'লতে চ'লতে লাফ দেয় সে, দেয় সে হামাগুড়ি
জ্ব'লতে জ্ব'লতে দাঁড়িয়ে পড়ে ক'রে ঘোরাঘুরি।
জ্যোতির রেখা সমথ পানে যতোই চলে আগে
বং বৃক্ষের ডালপালাতে আলোর ঝলক লাগে!
ঘরের থেকে, দাওয়ার থেকে, ছাদের থেকে যারা
রাত-দুপুরে লক্ষ্য করে আজব আলোর ধারা
চেঁচিয়ে ওঠে সবাই তারা দেখেই আলোর রং,
'ওই তো সে ডং! ওই তো সে ডং!
ডং ঘুরছে পেরিয়ে বন, পেরিয়ে আঁকবাঁক
ওই তো সে ডং! ওই তো সে ডং!
ডং চ'লছে সঙ্গে নিয়ে জ্বলজ্বলে তার নাক।'

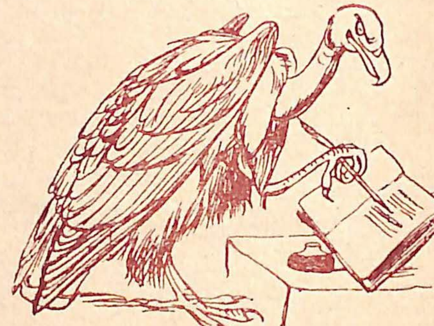
অনেক দিনের কথা--
জাম্বলিগুলোর জাম্বলি-মেয়ে
যতোদিন না ছাঁকনি বেয়ে
পৌঁছেছিলো তিরপূর্ণি এসে
ডং বেড়াতো নেচে গেয়ে হেসে।

তিরপূর্ণির কূলে, সেথায় সারি সারি
লম্বাটে সব ঝিনুক গজায় মজায় কাঁড়ি কাঁড়ি
এবং মেলে নিটোল ধূসর পাথর ভারী ভারী!
সেইখানেতে মাঠের সবুজ, বনের সবুজ তান
রোজ সকালে রাত-বেরাতের ধ'রতো সারিগান,
'জাম্বলিগুলোর সবুজে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি!'

হেলাফেলায় কেটে যেতো রঙ্গিখ্ খুশির দিন
আলোয়-ছায়ায় জোছনা রাতে মজায় তা-ধিন-ধিন!
নাচতো তারা গোল হ'য়ে সব সমস্ত রাত জুড়ে
হাসিখুশি ডং বাজাতো ভেঁপু করুণ সুরে!



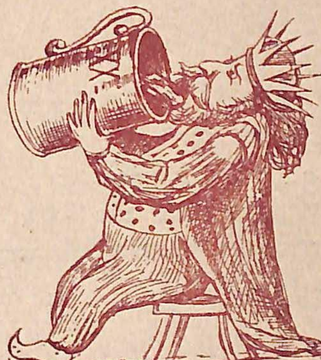
U তে Umbrella-maker––মানে ছাতাঅলা
ছায়া-ঢাকা ছাতিমতলায় ছাতাঅলা––উনি সব সময় ছাতায় মুখ ঢেকে রাখতেন, তাই ওঁর মুখ কেউ কখনো দেখে নি।



V তে Vulture––মানে শকুনি
শংকিত শতায়ু শকুনি––উনি একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতায় মাংসের কাটলেটকে কয়েকটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।



W তে Wasp––মানে বোলতা
বনবনে বোম্বেটে বোলতা––উনি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে মাথায় টুপি প'রে মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজিয়েছিলেন।



X এ Xerxes––মানে জেরাক্সেস
পারস্য দেশের পুরাকালের এক রাজার নাম। জেদী জেঁকো জেরাক্সেস সুস্বাদু পানা গিলছেন––উনি আদি যুগে পৃথিবীতে বাস ক'রতেন।

জাম্বলিগুলো ছিলো সবাই ভাবনা-চিন্তা হীন
আকাশী-রং হাতে এবং সাগর-সবুজ চুলে
ফুটফুটে সেই জাম্বলি-মেয়ে স্বপ্ন আনতো তুলে
ডং থাকতো পাশেতে তার স্বপ্ন দেখার দেশে।
জাম্বলিগুলো গেলো যেদিন সাগরজলে ভেসে
ডং রইলো প'ড়ে একা তিরপূর্ণির তীরে,
পাহাড় থেকে দেখলো ব'সে সবুজ ঘাসের ভিড়ে
সব্‌জেটে পাল পত্‌পতিয়ে যাচ্ছে মিশে দূরে!
গান গাইলো ফুঁপিয়ে তাই জাম্বলি-রাগের সুরে,
'জাম্বলিগুলোর সব্‌জে মাথা, নীলচে দু' হাত
ভিন-প্রদেশের গর-ঠিকানায় বাড়ি
থমথমানো রাত-দুপুরে সবাই মিলে
ছাঁকনি চেপেই সাগর দিলো পাড়ি।'
সূর্য যখন পশ্চিমেতে নামলো আকাশ বেয়ে
ডং ব'ললো চেয়ে,
'মাথায় আমার এক সময়ে বুদ্ধি ছিলো বটে,
পালিয়ে গেছে বুদ্ধি এখন নেইকো কিছুই ঘটে!'
সেদিন থেকে খ্যাপার মতো আজও তো ডং ঘোরে
দীঘির ধারে, বনের মাঝে পাহাড়ী পথ ধ'রে।

এখান-সেখান, মাঠে-ঘাটে বেড়ায় সে গান গেয়ে,
'জাম্বলি-মেয়ের দেখা আমি যেতেও পারি পেয়ে!
সারা জীবন এমনি ক'রেই ফিরবো একা-একা
যতো দিন না জাম্বলি-মেয়ের পাচ্ছি আবার দেখা!'

সেদিন থেকে ভেঁপুতে তার রূপুলি সুর গুঁজে
জাম্বলি-মেয়ে আছে কোথায় বেড়ায় খুঁজে খুঁজে।
রাত্তিরেতে যায় না খোঁজা কোথাও ঘুরে-ফিরে
আকাশ-কুসুম গাছেরই ছাল তাই তো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
গদার মতো নাক বানালো, বাপ্ রে কি উদ্ভটে,
লক্ষ-হাজার নাকের মধ্যে নাক হ'লো তা বটে!
সেই নাকেতে লালকালিতে রং-চিত্তির এঁকে
সুতো বেঁধে লাগিয়ে নিলো মাথার পিছন থেকে।
থালার মতন নাকের আগার ভেতরটাতে ফাঁপা,
পিদিম জ্বেলে জ্বালিয়ে দিয়ে ফেট্টি দিলো চাপা
        রাখতে আলো ঢেকে
        আড়াল ক'রে দমকা হাওয়ার থেকে,
পাছে আলো নিভে না যায় আঁধার ফেলে রেখে।
চাকার মতো সারি বাঁধা ফুটোগুলোর মুখে
আলোর হাসি মারলো উঁকি আঁধার রাতের বুকে।

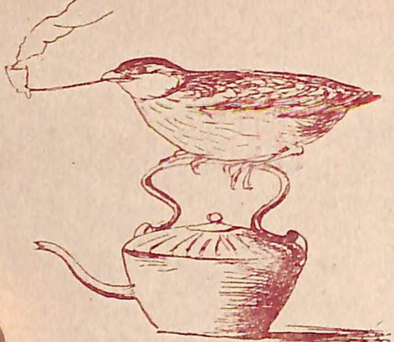
সে-রাত থেকে শুরু ক'রে প্রতি রাতেই একা
ডংকে যাবে মাঠে-ঘাটে খুঁজতে আজও দেখা।
কাদাখোঁচার নালিশ সালিশ ছাপিয়ে তোমার কান
ভ'রিয়ে দেবে হয়তো বা তার করুণ ভেঁপুর তান।
রাত নামলে খ্যাপার মতো একলাটি নির্বাক
ডং চ'লবে সঙ্গে নিয়ে জ্বলজ্বলে তার নাক।
যতোই খুঁজুক তবু জানি খোঁজাই শুধু সার
হদ্দ হ'য়ে ঠিক-ঠিকানা জাম্বলি-মেয়েটার!
ঘরের থেকে, ছাদের থেকে, দাওয়ার থেকে যারা
রাত-দুপুরে লক্ষ্য ক'রে আজব আলোর ধারা
উল্কা মাঠে ছুটছে যেন ঝরা-আলোয় লেখা
অমনি সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওই গিয়েছে দেখা,
সময় হ'লো এখন তো তাই একলাটি নির্বাক
ডং চ'লেছে সঙ্গে নিয়ে জ্বলজ্বলে তার নাক।
গহন রাতে খুঁজতে খুঁজতে যেখেনেই সে যাক
যেখেনেই সে যাক!
যেখেনেই সে যাক!
ডং চ'লবে সঙ্গে নিয়ে জ্বলজ্বলে তার নাক।'



হুতুমথুমোর নেইকো পায়ের আঙুল

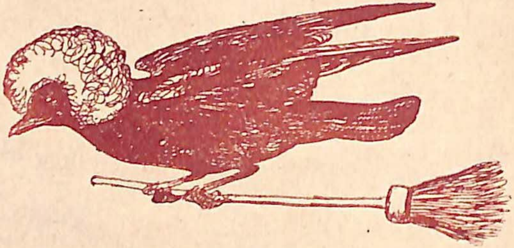
১

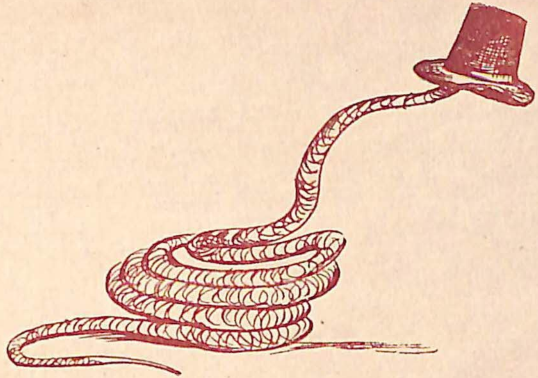
পায়ের আঙুল নেইকো হুতুমথুমোর
এক সময় ছিলো আঙুল সবার মতোই ওরে;
ব'ললে সবাই; 'ঘুচবে আঙুল ওর'—
শুনে হুতোম গান ধ'রতো, 'মাছডুমাডুম' ক'রে।
গোলাপ-রাঙা বানিয়ে পানা মিষ্টি গোলাপজলে
ঘুমপাড়ানি মাসি তো তার খাইয়ে তাকে বলে,
'দুনিয়াতে সবাই জানে নিজের চোখে দেখে
হুতুমথুমোর পায়ের আঙুল সেরা সবার থেকে।'



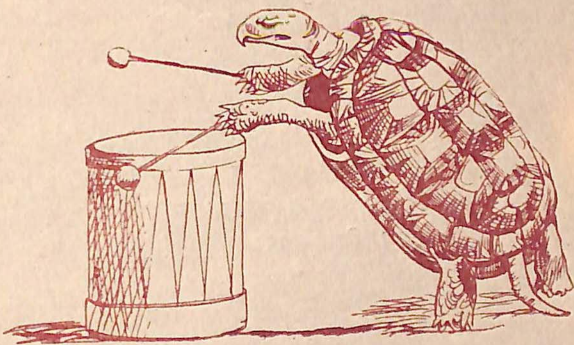
Qতে Quail---মানে তিতির পাখি
তিড়বিড়ে তিরিক্ষি তিতির পাখি---উনি চা করার টিনের কেটলি চেপে পাইপ ধ'রিয়ে ধূমপান করেন।

R এ Raven---মানে দাঁড়কাক
দাম্ভিক দার্শনিক দাঁড়কাক---উনি একটা শাদা পরচুল প'রে চাটাই-ঝাড়া ঝাড়ূ নিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন।





Sএ Snake––মানে সাপ
সদাশয় সাবধানী সাপ––উনি পাছে কাউকে ছোবল মারেন এই জন্যে মাথায় সব সময় টুপি প'রে থাকেন।



Tতে Tortoise––মানে কচ্ছপ
কচকচানি কথক কচ্ছপ––উনি ফাঁকা মাঠের মধ্যে সারা দিন ধ'রে ঢোলক পিটিয়েছেন।

২

সেদিন যখন বাগবাজারের খাল
হতুমথুমো সাঁতার কেটে হ'চ্ছে পারাপার
জড়িয়ে নাকে গরম কাপড় লাল,
তখনো সব পায়ের পাতার আঙুল ছিলো তার।
ঘুমপাড়ানি মাসি তাকে ব'লেছিলো যেচে,
'নাকটা গরম রাখলে পরে আঙুল থাকবে বেঁচে।'
হতুমথুমোর পায়ের আঙুল জানে তো পাঁচজনে
হারায় না আর নাকের কথা স্মরণ রাখলে মনে।

৩

জাহাজ ডিঙি আসলে কাছে জলে
হতুমথুমো সাঁতার দিয়ে জোরসে ভেসে যায়
রুন-ঝুন-ঝুন ঘন্টা নেড়ে চলে
পৃথিবীতে সবাই যেন শুনতে তাকে পায়।
মাসি কিম্বা নাবিকেরা ওপার পানে চেয়ে
চেঁচিয়ে বলে পাড়ের কাছে দেখতে তাকে পেয়ে,
'ঘুমপাড়ানি মাসির বেড়াল লাল-গুঁফো ওই মোটা
মাছ খাবে তাই মাছ ধরতে সাঁতার দিচ্ছে ওটা!'

৪

হতুম সেদিন ওঠার আগেই পাড়ে
লালরঙা তার ফেট্টি নাকের গেলো না আর পাওয়া
সাগর-সবুজ শুশুক এক্কেবারে
বাগবাজারের খালের থেকে ফেট্টি নিয়ে হাওয়া!
তখনো সব পায়ের পাতায় আঙুল ছিলো তার
ফেট্টি চুরি যেতে দেখে আঙুল নেইকো আর!
হারিয়ে আঙুল ভেবে তো তার ভরলো ব্যথায় বুক
হতাশ হ'য়ে, উদাস হ'য়ে পাংশু হ'লো মুখ।

৫

সক্কলেতে ভাবলো বারংবার
কোন ফাঁকেতে সেদিন হঠাৎ কি ক'রে যে হায়
বিশ্রীভাবে আঙুলগুলো তার
কে যে নিয়ে উধাও হ'লো অকূল দরিয়ায়!
বাগদা কিম্বা গলদা চিংড়ি কিম্বা নয়তো তবে
ধূর্ত কোন মৎস্যকন্যা হঠাৎ হয়তো হবে
পাঁচ জোড়া সে ক'রলো গায়েব পায়ের আঙুল তার
সঠিকভাবে কেউ জানে না বেয়াদপি কার!



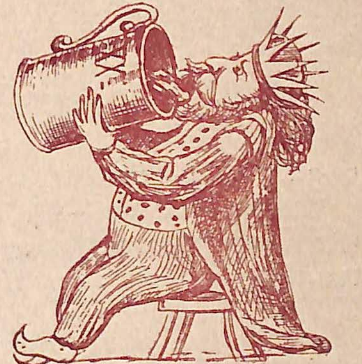
U তে Umbrella-maker––মানে ছাতাঅলা
ছায়া-ঢাকা ছাতিমতলায় ছাতাঅলা––উনি সব সময় ছাতায় মুখ ঢেকে রাখতেন, তাই ওঁর মুখ কেউ কখনো দেখে নি।

V তে Vulture––মানে শকুনি
শংকিত শতায়ু শকুনি––উনি একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো খাতায় মাংসের কাটলেটকে কয়েকটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।





W তে Wasp—মানে বোলতা
বনবনে বোম্বেটে বোলতা—উনি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে মাথায় টুপি প'রে মিষ্টি সুরে বাঁশি বাজিয়েছিলেন।



X এ Xerxes—মানে জেরাক্সেস
পারস্য দেশের পুরাকালের এক রাজার নাম। জেদী জেঁকো জেরাক্সেস সুস্বাদু পানা গিলছেন—উনি আদি যুগে পৃথিবীতে বাস ক'রতেন।

ইচ্ছে আমার তোমার পিঠের সঙ্গী হবো এক
কিম্বা ক'রবো ক্যাঙারু-ভাই,
ল্যাজে তোমার ব'সে যে প্যাঁক-প্যাঁক
সারাটা দিন কেবলি একঠাঁই।
তেপান্তরের মাঠ, তিরপূর্ণির ঘাট
সাগর ডাঙা পেরিয়ে পত্রপাঠ
যাবো যখন তখন দোঁহের হবে কি মজাই!'
হাঁস ব'ললো, 'ক্যাঙারু-ভাই!'

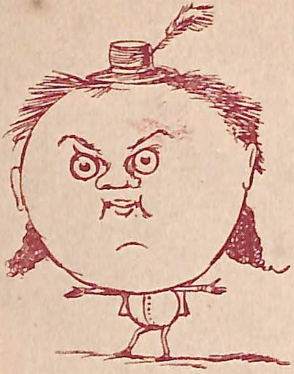


ক্যাঙারু-ভাই ব'ললো তখন হাঁসকে চুপিসাড়ে,
'ভেবেছি যা ব'লছি তোমার কাছে
তোমার কথায় হয়তো আমার বরাত ফিরতে পারে
কিন্তু একটা আপত্তি যে আছে।

ব'লি অভয় দাও তো, ভাবো নিজে
পা যে তোমার বিশ্রী ঠাণ্ডা ভিজে
অপঘাতে সর্দি-বাতে আমিই মারা যাই!'
হাঁসকে বলে ক্যাঙারু-ভাই।



হাঁস ব'ললো, 'সেদিন গিয়ে পাহাড়-চুড়োয় সোজা
এই কথাটাই ভেবেছি মুখ বুজে!
তাই কিনেছি জোড়া চারেক পশম-বোনা মোজা
আমার পায়ের পাতার মাপের খুঁজে।
টানবো একটা চুরুট প্রতি দিনে
গরম রাখতে আলখাল্লাও কিনে
তোমার ভালবাসার আমি সঙ্গী হ'তে চাই,
লক্ষ্মী সোনা ক্যাঙারু-ভাই!'



Y তে Young boy—মানে যুবক
যুগোপযোগী যুক্তিহীন যুবক—উনি মাথায় একটা ছোট্ট টুপি পরেন, কিন্তু মাথাটা ওঁর শরীরের চেয়ে অনেক বড়।

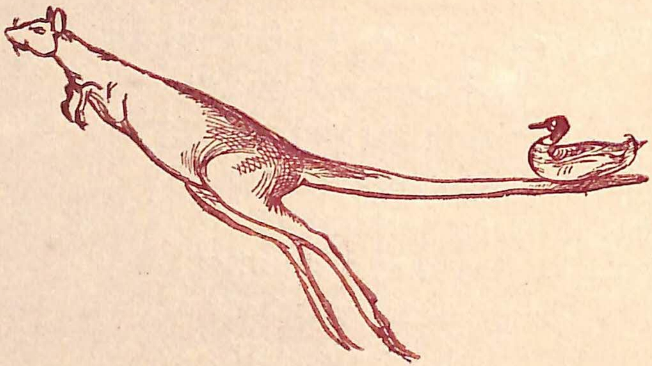
Z এ Zebra—মানে জেব্রা
জ্যালজেলে জেল্লার জেব্রা—উনি পাঁচটা বাঁদরকে সোজা কিষ্কিন্ধ্যায় পিঠে ক'রে ব'য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

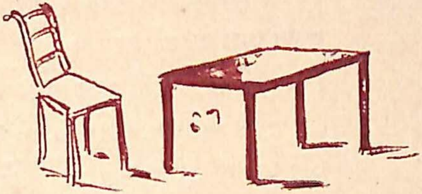




ক'গাছা আগাছা

আবছা চাঁদের আলোয় তখন দিগ্‌-দিগন্ত মোড়া
ক্যাঙারু-ভাই ব'ললো, 'রেডি আমি,
কায়দা ক'রে ধরো হে হাঁস আমার ল্যাজের গোড়া
চ'লতে গেলে আর কি আমি থামি!'
লাফিয়ে তারা চ'ললো বেঁধে জোড়া
তিন তিনবার বিশ্ব হ'লো ঘোরা!
তাদের মত সুখী বলো কোথায় খুঁজে পাই
যেমন হাঁস ও ক্যাঙারু-ভাই।





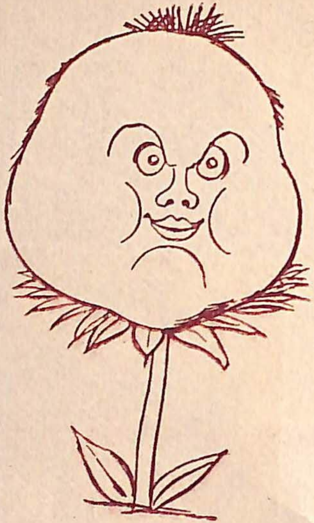
টেবিল এবং চেয়ার

টেবিল কহিল কথা চেয়ারেরে ডাকি,
'এ গরমে ঘরে আমি কি কষ্টে যে থাকি!
জবজবে ঘামে ভিজে হাজা চারি পায়
এভাবে কাটালে দিন মজা কি দাঁড়ায়?
তার চে' মনের সুখে পা দুই চ'লি
প্রাণের জমানো কথা প্রাণ খুলে ব'লি,
মুক্ত বাতাস কিছু নিতে পারি কেড়ে!'
টেবিল কহিল ডাকি ঐ চেয়ারেরে।

চেয়ার তেরিয়া হ'য়ে টেবিলেরে কয়,
'পারো না হাঁটিতে কভু, জানো নিশ্চয়?
কেন যে বোকার মতো আবদার করো!'
টেবিল জবাব দিলো হ'য়ে জড়োসড়ো,
'পারি কি না পারি তাহা ক'রে দেখি চেষ্টা
না পারিলে পরে হাল ছাড়ি দিব শেষটা!
আমারও যে ক'টি পা, তোমারও তো তাই
চলো, চলো দুই জনে কিছুটা তো যাই।'

সাগরজলিস মৎস্যডালিয়া

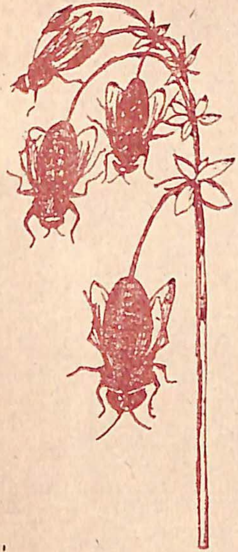




চাঁদবদনীয়া বিপুলিয়া

তালকানাইয়া স্বাস্থ্যকরসা





নীলশিশি মৌমাছিয়া
গুনগুনিয়া

কাঁটাচামচেয়া বোতলিয়া

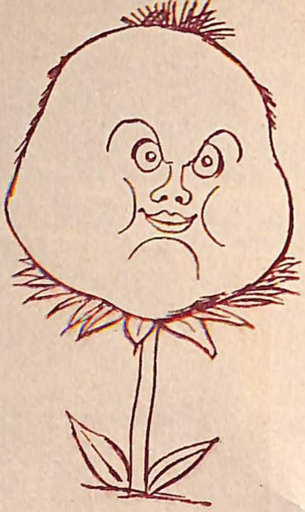




তোতাপাখি একীকরণীয়া

সাগরজলিস মৎস্যডালিয়া

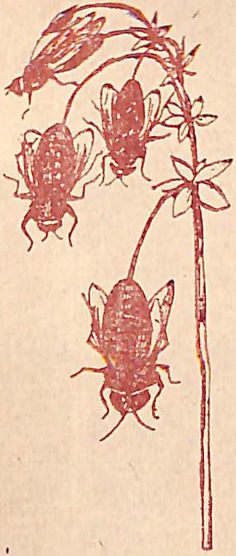




চাঁদবদনীয়া বিপুলিয়া

তালকানাইয়া স্বাস্থ্যকরসা





নীলশিশি মৌমাছিয়া
গুনগুনিয়া

কাঁটাচামচেয়া বোতলিয়া





তোতাপাখি একীকরণীয়া



কাকাতুয়া উত্তমিয়া

জনগণিয়া মাথানিচুঝুলিয়া

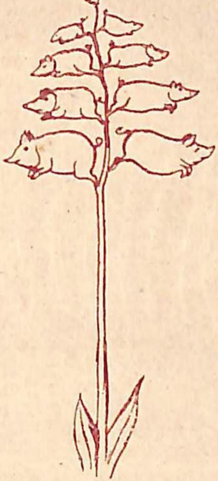




গীটারিয়া পেনিসিলিস

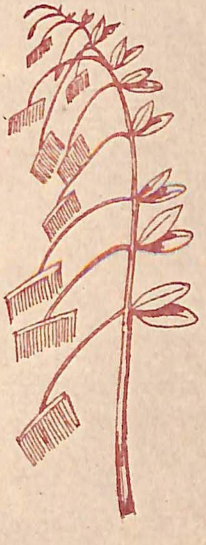
ধূমপানপাইপিয়া
চমৎকারালিস

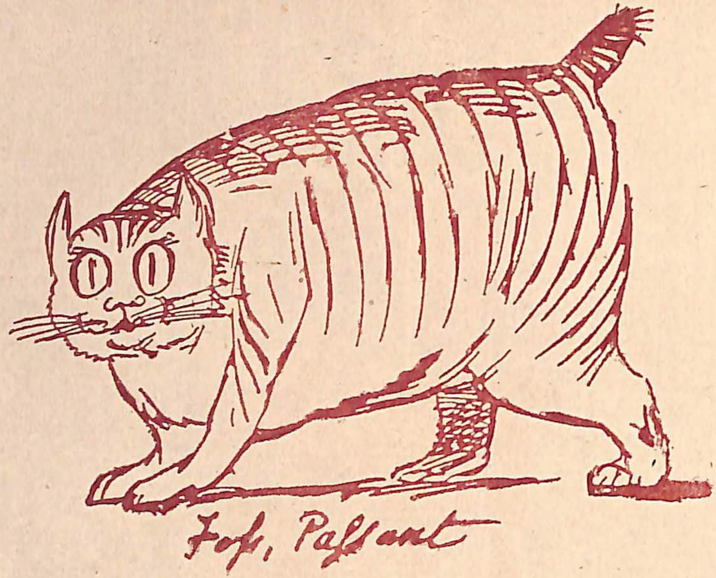




শূকরীয়া পিরামিডালিস

ছোটদাঁড়াচিরুণীয়া
গৃহস্থালীয়া



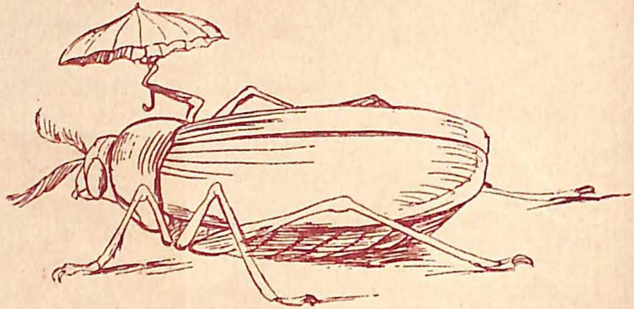


বুড়ো ফস

লিয়ার নামে মানুষ







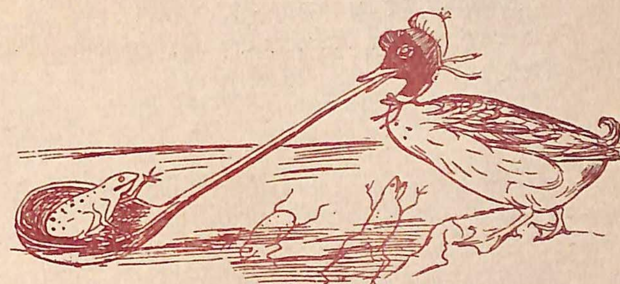
Bতে Beetle--মানে গুবরেপোকা
গুনধাম গুঞ্জরিক গুবরেপোকা--
উনি বৃষ্টি না হলে একটা সবুজ ছাতা
সঙ্গে রাখতেন, কিন্তু বিষ্টি-বাদলায়
ছাতাটা ঘরে ফেলে আসতেন।

Aতে Ass--মানে গাধা
গদগদ গবা গাধা--উনি একটা পিপের মধ্যে
থাকতেন, আর সোডা, লেমনেড ও শশার চাটনি ছিলো
ওঁর খাদ্য।



C তে Cow––মানে গোরু
গোধূলির গোপনীয়
গোরু––উনি বটুকখানায় লাল চামড়া মোড়া হাতল আঁটা চেয়ারে ব'সে শীত-পোয়ানো আগুনে পাউরুটি সেঁকে নিজে টোস্ট করতেন।

D তে Duck––মানে পাতিহাঁস
পাটকিলে পাগলা পাতিহাঁস––
উনি রাত্তিরের খাবারের জন্যে হাতার মতো চামচে ক'রে একটা ছিটছিটে ব্যাঙ ধ'রেছিলেন।



প্রায় সওয়া শো বছর আগে, ১৮৪৬ সালে ইংরেজি ভাষায় একটি লম্বাটে চেহারার ছোট্ট বই বেরুল। ছড়ার বই। ছবির বই। যেমন সে ছড়ার ছাঁদ, তেমনি সে ছবির ছিরি। উদ্ভুটি। আজগুবি। অদ্ভুতুড়ে। ইংরেজি ভাষায় এমন বই আর কখনও ছাপা হয় নি। চেনা মুখের ওপর যেন অচেনার হাল্কা আলো। রং-বেরংয়ের নক্শাকাটা মুখোসগুলো ভয় দেখায় না, বরং খুশিতে মন ভরিয়ে তোলে। সরল চেহারাগুলো তির্যক দেখায়, বাঁকাচোরাগুলো কিছু বা সিধে। অথচ তার হদিশ পেতেই মন হয়ে ওঠে শরিফ। নির্মল হাসি সোডা ওয়াটারের মত ভসভসিয়ে ওঠে গম্ভীর ভারী মুখগুলোতেও।

তাই 'Book of Nonsense' বেরুতেই তার ছড়াকার-চিত্রকর এডওয়ার্ড লিয়ার হয়ে উঠলেন বিখ্যাত। ইংরিজি জানা আট থেকে আশী বছরের তাবৎ পাঠকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল তাঁর নাম। অথচ এই লেখাগুলো অব-হেলায় পড়েই ছিল। এক যুগের ধুলো জমেছিল পাণ্ডুলিপির পাতায় পাতায়। বন্ধুদের আগ্রহে বাতিল কাগজের স্তূপ থেকে উদ্ধার করা না হলে এগুলো কোন দিন ছাপাখানার মুখ দেখতো কিনা সন্দেহ। তবু সসঙ্কোচ সেই আত্মপ্রকাশ কল্পলোকের বেড়া টপকে ছড়াছবির হাত ধরে আজব সব চরিত্র হয়ে ভাসতে থাকলো চোখের সামনে। যেখানে বুড়োর দাড়িতে বাসা বানিয়ে পাখিরা দিন কাটায় খাসা, মাঠ ছেড়ে গাছের মাথায় চড়ে বসে গোরু, দীর্ঘ নাক কাঁধে বইতে পরিচারিকা নিয়োগ করতে হয় নাকের মালিককে, নখ কাটলে কাটবে আঙুল এমনি স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, আর এমনিই সব আবোল-তাবোল, ওলোট-পালোট কত কি!

খেয়াল-রসের এক নম্বর বই প্রকাশমাত্র যে সাড়া জাগল তা অভূতপূর্ব। তখনকার দিনে অকল্পনীয়। বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট-বড়োর কাড়াকাড়িতে ফুরিয়ে গেল প্রথম সংস্করণ। তারপর থেকে লিয়ারের নতুন বই যত প্রকাশিত হয়েছে গরম পিঠের মত দেখতে দেখতেই তা খতম। ছোটরা পড়ে, ছিঁড়ে, খেয়ে তার সত্যিকারের কদর করেছে। খুঁজলে চার শো বছরের পুরোনো সেক্সপীয়ারের রচনার প্রথম মুদ্রণ হয়ত পাওয়া যায়, কিন্তু সওয়া শো বছরের লিয়ারের বই কোথ্থাও

নেই। বৃটিশ মিউজিয়ামকেও 'বুক অফ ননসেন্স'-এর তৃতীয় সংস্করণের একটি কপি সংগ্রহ করে খুশি থাকতে হয়েছে।

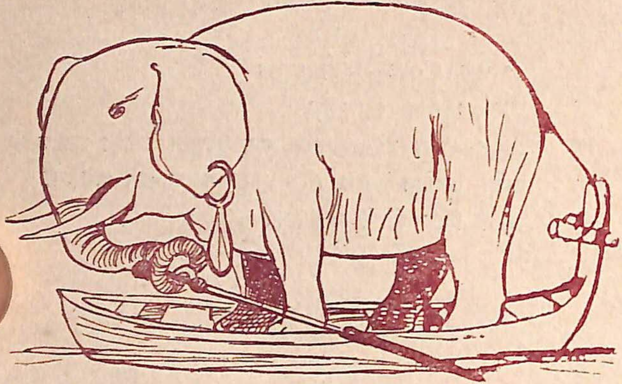
সে কথা থাক। প্রথম প্রকাশেই চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। প্রখ্যাত ইংরেজি সাহিত্য সমালোচক জন রাস্কিন বললেন, একশো জন সেরা সাহিত্যিকের যাবতীয় রচনার মধ্যে বুক অফ ননসেন্সই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। লেখা নিয়ে যত আলোচনা হল, লেখক নিয়েও তার চেয়ে কম কিছু নয়। কত আজগুবি কাহিনীই না প্রচার হল তাঁর সম্পর্কে। তিনি নাকি বইয়ের পাতা থেকে সরাসরি পাঠকের সামনে হাজির হতে পারেন। এমনি ধারা সব মজার মজার কথা। কেউ বললেন, এ লেখা নবীন কারো নয়, কোন প্রবীণ পটু হাতের সোনালী ফসল। খোঁজা চলল লিয়ার-মুখোসের আড়ালে লুকোনো নামী লেখকের আসল মুখটা। কেউ খুঁজে পেলেন লর্ড ব্রূহামের লেখার ঢং ; বললেন, এ তাঁরই কীর্তি। কেউ আবিষ্কার করলেন, ডাবির আর্ল (EARL) নিজেই বুক অফ ননসেন্স-এর লেখক। নিজের নামের বানানটা একটু বদলে সাজিয়েছেন শুধু (LEAR)। কারণ বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল ডাবির আর্ল-এর নাতি-নাতনি আর তাদের ছেলে-মেয়েদের।

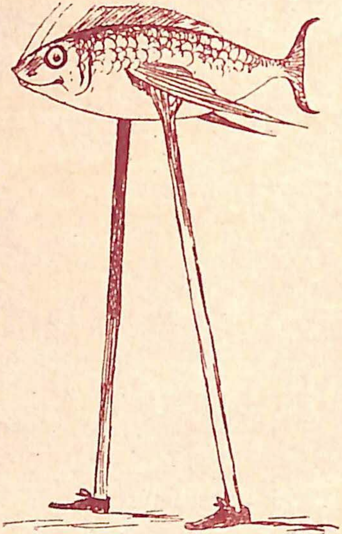
অনেক লেখালিখি চললো কাগজপত্রে। আলোচনা চললো লোকের মুখে মুখে। কৌতুকময় ঘটনাও ঘটে গেল কিছু কিছু।

নির্মল হাস্যরসের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল লিয়ারের করায়ত্ত, অথচ মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন কিঞ্চিৎ গম্ভীর। স্বল্পভাষ। তবু নিজেকে নিয়ে কত রঙ্গ করেছেন। কবিতায়, চিঠিপত্রে, আত্ম-পরিচিতির ছত্রে ছত্রে। কৌতুক করেছেন তাঁর স্থূল শরীরের আয়তন নিয়ে, উঁচু গোল ভুরু নিয়ে, তাঁর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল নিয়ে।

পেশায় ছিলেন তিনি চিত্রশিল্পী। নিসর্গ চিত্র, পক্ষিকুল তাঁর তুলির রেখায় নিখুঁত ফুটে উঠত। সত্যিকারের জাতশিল্পী লিয়ার জীবিকার সন্ধানে যদি বারংবার তাঁর পথ পাল্টাতে বাধ্য না হতেন তবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসনটি তাঁর নামেই হয়ত চিহ্নিত হত। তার বদলে তিনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন জলরঙের স্কেচ-এ, খামখেয়ালী ছড়ায় আর তার সঙ্গে পাল্লা-দেওয়া ছবিতে, যার শুরু হয়েছিল আর্লের বাড়ির বালক-বন্ধুদের মনোরঞ্জনের খেলায়।

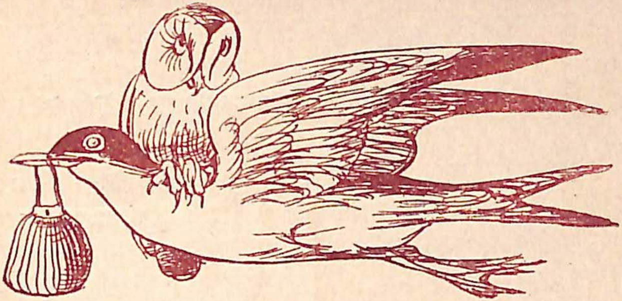
বস্তুত তাঁর মনের ভেতর একটা প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ছিল। আর্থিক অস্বাচ্ছল্য ও শারীরিক অসুস্থতা এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতর করেছিল। তাঁর চিন্তায়, তাঁর কলমে, তাঁর তুলিতে এমন অসম্ভব অদ্ভুতুড়ে সৃষ্টিছাড়া চরিত্রের আবির্ভাব সেই দ্বন্দ্বেরই ফল-শ্রুতি। বলা যেতে পারে, আপন মনের স্বস্তির সন্ধানে কতকটা আকস্মিক ভাবেই তিনি এই খেয়াল-খুশির জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। আর সেই অভিযাত্রায় তিনি খুঁজে পেলেন আনন্দ-রসের নিত্য-নতুন উৎস-মুখ। তাঁর সংগৃহীত সম্পদগুলি পাতায় পাতায় পরিবেশন করে ছোটদের চিরকালীন বন্ধু হিসেবে বেঁচে রইলেন।



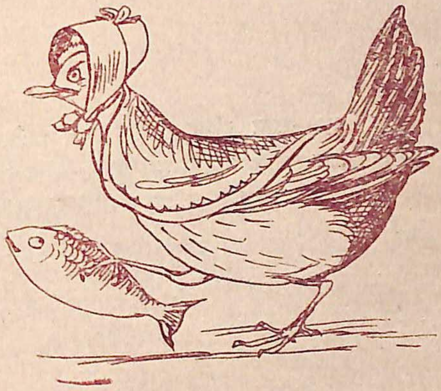


Eতে Elephant––মানে হাতি
হাড়-হাভাতে হাবলা হাতি–– উনি কানে দুল প'রে উনুন খোচানোর শিক দিয়ে দাঁড় বেয়ে জল পার হ'য়েছিলেন।

Fএ Fish––মানে মাছ
মেঘনার মাঝারি মাছ—উনি হাঁটার সময় রণ-পায়ে হাঁটেন, কারণ ওঁর নিজের কোন পা নেই।



Gতে Gull--মানে শঙ্খচিল
শূন্যে শোঁ-শোঁ শঙ্খচিল--উনি নিজের কার্পেটের লাল থলি আর একটা প্যাঁচাকে নিয়ে উড়ে নদী পেরোলেন, কারণ সাঁতার জানেন না।



Hএ Hen--মানে মুরগী
মুখরা মুমূর্ষু মুরগী--উনি একটা নীল টুপি প'রে গায়ে শাল জড়িয়ে বাজার থেকে রাত্তিরের খাবার জন্যে মাছ কিনে এনেছিলেন।

১৮১২ সালের ১২ই মে হাইগেটে জন্মেছিলেন এডওয়ার্ড লিয়ার। তাঁর জীবন অবসান হয়েছিল ১৮৮৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি। তখন তিনি বাস করছিলেন ইতালির সান-রেমোতে। কাছে ছিল তিরিশ বছরের সঙ্গী আলবেনীয় পরিচারক কোকালি। আর আদরের পুষি বেড়াল, যার অজস্র ছবি তিনি এঁকেছেন, বিভিন্ন লেখায়, এমন কি ছড়ার ছাঁদে নিজের ছবিতেও যার প্রিয় সঙ্গ-প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে ভুল করেন নি, সেই 'ফস' দীর্ঘ সতেরো বছর একসঙ্গে কাটিয়ে তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে এখানেই দেহরক্ষা করেছিল।

লিয়ারের বাবা জেরেমিয়া ছিলেন একজন শেয়ার বাজারের দালাল। ঐ কাজে তিনি যেমন দক্ষ ছিলেন, অর্থ উপার্জনও করেছিলেন তেমনি দু'হাত ভরে। ডারহামের এক জাহাজী ক্যাপ্টেনের মেয়ে অ্যান স্কেরিটকে বিয়ে করেছিলেন। স্ফূর্তিবাজ জেরেমিয়া আর বুদ্ধিমতী অ্যানের সংসার ছিল সদানন্দময়। এডওয়ার্ড ছিলেন তাঁদের একুশটি সন্তানের কনিষ্ঠতম। এবং সবচেয়ে দীর্ঘজীবিও। একুশ জনের মধ্যে তেরো জনই বোন। পাঁচ ভাইবোনের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। এডওয়ার্ডেরও জীবন সংশয় দেখা দিত যদি বড়দিদি অ্যানের সান্নিধ্য ও পরিচর্যা না জুটত। তাঁর বাড়িতেই ডেরা বেঁধেছিলেন লিয়ার। পঞ্চাশ বছর বয়সে বড়দিদির মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থাই চলেছিল।

ক্ষীণদৃষ্টির জন্যে স্কুলের নিচু ক্লাশেই এডওয়ার্ডের পড়াশুনায় ছেদ ঘটে। ফিটের উপসর্গ দেখা দিয়েছিল মাত্র সাত বছর বয়সে। তবে দুঃসময় চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৮২৫ সালে যখন জেরেমিয়া শেয়ার বাজারের নিয়মে রাতারাতি প্রাচুর্যের চুড়ো থেকে একেবারে পথের ভিখিরি হয়ে গেলেন। তিনি শুধু সর্বস্বান্তই হলেন না, দেনার দায়ে তাঁর জেল পর্যন্ত হল। সুন্দর সাজানো সংসার ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেল। নানা যন্ত্রণার মধ্যে আরও চার ভাইবোন মারা গেল।

বড়দিদির আশ্রয়ে এসে শারীরিক দিক থেকে এডওয়ার্ড বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁকে বাঁচালো ছবি আঁকায় তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা। ছবির নেশায় তিনি ডুবে গেলেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই অর্থের চাহিদায় পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছবি ফিরি করেছেন। তবু নন্দনতত্ত্বে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। ছবির ব্যাকরণ, প্রয়োগ, রঙে তাঁর অধিকার বিস্ময়ের সঞ্চার করে। খুব নিচু ক্লাশেই স্কুলের পালা চুকিয়ে দিলেও প্রাচীন ও আধুনিক গ্রীক সহ অন্তত আধ ডজন ভাষা তাঁর আয়ত্তে ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আঁকতেন। অদ্ভুত দক্ষতা ছিল পাখির সার্থক চিত্রায়নে। গান গাইতে পারতেন, সুরবোধ ছিল সুন্দর। নিজের সুরে গান বেঁধেছেন অজস্র। হাল্কা চালের কবিতা লিখেছেন। দীর্ঘ ডায়েরী, পত্রাবলী লিখেছেন। ছবির জগতে এনেছেন কৌতুকোদ্দীপক নতুন চিন্তাধারা। এই অনন্যসাধারণ গুণাবলীর স্বীকৃতিতেই মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ছবি আঁকা শেখানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল এক সময়।

এসব অবশ্য পরের কথা। অর্থের তাগিদে ছবি ফিরি করতে শুরু করলেন পনেরো বছর বয়েসে। ছবিগুলোর এমনি টান ছিল যে প্রায় হাতে হাতেই বিক্রি হয়ে যেত। দাম জুটত ন' পেনি থেকে চার শিলিং।

দিন কাটছিল এমনিই। হঠাৎই চিড়িয়াখানায় একটা কাজ জুটলো শ্রীমতী ওয়েন্টওয়ার্থের চেষ্টায়। এ সময় পাখিদের জীবন-প্রণালী নিয়ে একটি বিপুলাকার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যাতে লিয়ারের আঁকা পাখির ছবিগুলো বিশেষ রূপে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। সেই সূত্রেই ডার্বির আর্ল তাঁকে নিয়ে আসেন নিজের পাখির আড্ডায়—ছবি আঁকার কাজ দিয়ে। নানা পাখির ছবি এঁকেছিলেন লিয়ার সে-সময়। আর একটানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আর্লের বাড়ির বাচ্চাদের মন ভোলাতে রচনা করেছিলেন তুলির টানে কলমের আঁচড়ে যুগল-বন্দী সেই অবিস্মরণীয় সচিত্র লিমেরিকগুলি। হাসির বারুদ-ঠাসা তুবড়ি। মুহূর্তে আনন্দ-ঝলমল হয়ে ওঠে মনের আকাশ।

খেয়ালী-রসের রাজ-সিংহাসনটি পাকা হয়ে গেল তাঁর নামে। অবশ্য জন্মসূত্রেই তিনি যেন এ আসনের দাবিদার। ডেন-মার্কে বাড়ি ছিল তাঁর। আবার তাঁর পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন আয়ারল্যাণ্ড থেকে। ঠিক যেমন রূপকথার জাদুকর হ্যান্স এণ্ডারসন, যিনি জাতে দিনেমার—আবার আইরিশ ভাষা এবং সাহিত্যের অনুরাগী। এ উদাহরণ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না যে আইরিশ-ড্যানিশ মিশ্রণেই শিশু-সাহিত্যের আজব ধারাটি সব চাইতে পুষ্টি লাভ করেছে।

লিয়ারের আজগুবি ছবি, খামখেয়ালী ছড়া, আজব রসের গল্প তাঁর অনন্ত কৈশোরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। লিয়ার যে প্রাচীন পাথরগুলির ছবি আঁকতেন একদিকে তিনি ছিলেন তেমনি বুড়োর বুড়ো, অন্যদিকে যে শিশুরা ছিল তাঁর ভালবাসার বস্তু তাদের চাইতেও কচি সবুজ তাজা তরতরে ছিল তাঁর মন। আর দেখতে কেমন ছিলেন লিয়ার? মোটাসোটা, ঝাঁটা-গুঁফো, গম্বুজের মত গোল উঁচু ভুরু। ছোট ছোট চোখ, তাও চশমায় ঢাকা। পোশাক-আশাক বাচ্চাদের মত ঢিলেঢালা, অগোছালো। এবং তাঁর অস্বাভাবিক মানসিক গঠন কোন সময়েই বয়েসের ছাপ ফেলতে পারে নি তাঁর ওপর। চিরকুমার লিয়ারের অফুরান কৈশোরের বর্ণময় প্রকাশ তাঁর ছবিতে ছড়াতে গল্পে কবিতায় নানা সুরের গানে গানে।

সৌভাগ্যক্রমে লিয়ারের প্রতিকৃতি নতুন করে আঁকার আর প্রয়োজন নেই। নিজের কথা বলতে তিনি ভালবাসতেন। রেখায় লেখায়, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তার অজস্র পরিচয় রেখে গেছেন। তাছাড়া রয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় 'ছড়ার ছাঁদে নিজের ছবি', যা এ সংকলনের গোড়ার দিকে ছাপা হয়েছে।

এডওয়ার্ড লিয়ারের মত পরিশ্রমী প্রতিভা পৃথিবীতে বোধ হয় আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অসাধারণ অধ্যবসায়ী ছিলেন তিনি। কোন কাজ শুরু করলে তার সফল সমাপ্তি না দেখে কখনই সোয়াস্তি পেতেন না। তাঁর পঞ্চাশ বছরের কর্মব্যস্ত শিল্পীজীবনে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। বিখ্যাত কবি লর্ড টেনিসনের কবিতাবলী সচিত্রকরণের কাজে তাঁর দু'শো'র চেয়ে বেশি অমূল্য ছবি কবিকে এত মুগ্ধ করেছিল যে তিনি শিল্পীর উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কবিতায়।

লিয়ার কত দ্রুত পরিশ্রমসাধ্য সব ছবি আঁকতেন তার হিসেব করতে বসলে অবাক মানতে হয়। অবিশ্রান্ত ছবি আঁকতে পারতেন তিনি। ভ্রমণকালীন একটি বছরে তাঁর আঁকা স্কেচগুলির সংখ্যা দেখলেই তা অনুমান করা যায়। ১৮৬৫'র সাল-তামামিই লক্ষ্য করা যাক : ক্রীটে থাকতে আঁকা স্কেচের সংখ্যা ২০০, কোনিসে ১৪৫, নীস-এন্টিবস ও কেনসে ১২৫। তিনি একবার ছ'মাসের জন্যে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। সে-সময় ইংলণ্ডে যে ডেসপ্যাচ পাঠাতেন তার ভেতর কম পক্ষে ৫৬০টি ছোটবড় ছবি ছিল। তাছাড়া নিজের ন'টি ড্রয়িং খাতা আর চারটি জর্নালও ভরে ফেলেছিলেন। তখন তাঁর বয়েস বাষট্টি ছাড়িয়েছে। বিদেশে ঘুরে বেড়াবার সময় ছবির প্রদর্শনী থেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থ সংগ্রহ করতেন। এবং রোমের দৃশ্যাবলী, ইতালি ভ্রমণ, আলবেনিয়া ও ইলিনিয়ার প্রকৃতি-দৃশ্যের জর্নাল, দক্ষিণ ক্যালাব্রিয়ার প্রকৃতি-দৃশ্যের চিত্রকর, আইয়োনিয়া দ্বীপের সাতটি চিত্রাবলী, কর্সিকার প্রকৃতি-দৃশ্যের জর্নাল প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রসমূহ এই ভ্রমণকালেই অন্যান্য অর্থকরী কর্মব্যস্ততার মধ্যে আঁকা।

লিয়ার যেন ছবি আঁকতেই জন্মেছিলেন, তাঁর সংখ্যাহীন চিত্রাবলী একথাই প্রমাণ করে। অথচ আশ্চর্য, চিত্রকলা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি অতি সামান্যই বলেছেন। বস্তুত স্বল্পভাষণ তাঁর শিল্পী-প্রতিভাকে তাঁরই প্রকরণগত উৎকর্ষের আড়ালে ঢেকে দিয়েছিল। মজার কথা, তিনি নিজেও নিছক ভূচিত্রাঙ্কেতা হিসেবে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন।

তবু অন্নচিন্তা চমৎকারা। অর্থের চিন্তায় এডওয়ার্ড লিয়ারকে সারাজীবন ধরেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। যদিও তিনি প্রচুর আয় করেছেন, তবু নিজের স্বভাবের জন্যেই হাতে কখনই নগদ টাকাকড়ি বড় একটা থাকত না। স্থায়ী কোন আয় ছিল না বলেই আর্থিক ব্যাপারে কোন সময়েই নিশ্চিন্ততা বোধ করেন নি, অহেতুক চিন্তাপীড়িতই হয়েছেন বার বার। তারই মধ্যে দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত স্বল্প-পরিচিত সাহায্যপ্রার্থী মানুষকে দু'হাতে দান করতে ইতস্তত করেন নি এতটুকু। তাঁর মত ছিল, খরচ করার জন্যেই তো টাকা-পয়সা রোজগার করা। বই থেকে তাঁর কিছু আয় হতো—আর ছবির ভ্রাম্যমান প্রদর্শক

হিসেবে করফু, ভ্যালেট্টা, সান-রেমোতে প্রদর্শনী করে প্রচুর ছবি বিক্রি করেছেন। শেষের দিকে ওয়ারড়োর স্ট্রীটের ফুরডের গ্যালারিতে তাঁর ছবির স্থায়ী প্রদর্শনী ছিল।

অবশ্য খদ্দেররা ছবি কিনলেও ঝটপট পয়সা মিটিয়ে দিত না। এ ব্যাপারে তাগিদ দিতে লিয়ার সংকোচ বোধ করতেন। গুণমুগ্ধ বন্ধুরা যদি লিয়ারকে নিয়মিত কিছু কিছু সাহায্য না পাঠাতেন তাহলে অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠত। তাই যখনই এই উৎসে ভাঁটা পড়ত তখনই লিয়ারকে প্রচণ্ড মুশকিলে পড়তে হয়েছে। 'এসব সাহায্য একদিন বন্ধ হয়ে যায়ই, তবু খাদ্য, পানীয় ও বস্ত্রের চাহিদা অফুরন্ত থাকে'—এ খেদোক্তি এডওয়ার্ড লিয়ারেরই।

আরেকটি বিষয়ে লিয়ারের প্রবল আকর্ষণ ছিল, সেটি হল ভ্রমণ। তিনি ছিলেন সত্যিকারের ভবঘুরে। ছবি আঁকার নেশায় এবং তাগিদে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। চোখের সামনে এসেছে আশ্চর্য দৃশ্যাবলী—তুলির টানে টানে তাদের জীবন্ত করে তুলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, কোন ভ্রমণই তাঁর কাছে নিছক প্রমোদ-ভ্রমণ ছিল না, কিছু পেশাগত তাড়নাও ছিল তার পেছনে। যেমন একবার আলবেনিয়া ভ্রমণের সময়ে পিভলি ছেড়ে আখরিদায় চলে গেলেন কেবলমাত্র একথা ভেবেই যে সেখানে অনেক মূল্যবান ছবির বিষয়বস্তু মিলবে। কর্সিকান জর্নালে ঠিকই লিখেছেন যে তিনি একজন ভ্রাম্যমান শিল্পী, শুধুমাত্র পেটের দায়ে বৈচিত্র্যময় ছবির সন্ধানে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন। বস্তুত তাঁর পর্যায়ের অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কোন শিল্পীকে কখনও জীবিকার জন্যে এত নিদারুণ পরিশ্রম করতে হয় নি। তাঁর সুদীর্ঘ ভ্রমণ তালিকায় যে দেশগুলির নাম দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে আছে—আলবেনিয়া, গ্রীস, কর্সিকা, মাল্টা, ক্রীট, মিশর, করফু, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালি, ফ্রান্স, রিভিয়েরা, এমন কি ভারতবর্ষও। অবিরাম চলমান এই মানুষটি ভ্রমণ প্রসঙ্গে বলেছেন, মানুষ তো আর গোল আলু নয়, চুপচাপ ঘরের কোণে পড়ে থাকার চেয়ে পিঁপড়ের মত ক্রমাগত সঞ্চরণশীল অবস্থাই অধিক কাম্য। এই ধারণাই তাঁকে সর্বদা প্ররোচিত করেছে, অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় জুড়ে তাই ভ্রমণ সংক্রান্ত কর্মসূচিতেই তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।

লিয়ারের এই খাপছাড়া সৃষ্টি শুধু কৌতুক, পরিহাস আর আনন্দমাত্র নয়, এ তাঁর আবিষ্কৃত একেবারে নিজস্ব জগৎ। এ জগতের ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি, আবহাওয়ার যাবতীয় খবর শুধু তাঁরই জানা। এমনই এক রাজ্য সেটা, যা আমাদের এই চেনাজানা পৃথিবীর ছবিটা একেবারে উল্টে দেয়। খেয়াল-রসের ভিয়েন চড়িয়ে এমনই এক আজব দুনিয়ার রূপ তুলে ধরেছেন তিনি, যা অসম্ভব আর উদ্ভট হলেও তাঁর শান্ত মেজাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এই কৌতুকময় আশ্চর্য জগৎটি

একদিকে যেমন তাঁর সুদীর্ঘ কৈশোরের অনেক মধুর বাসনা চরিতার্থ করে, অপর দিকে সেই জগতের আনন্দবহ বাতাসের স্পর্শে বাস্তবতার মালিন্যে ক্লান্ত আমাদের এই মনকে সজীব করে তোলে। তাঁর একটি আজগুবি ইচ্ছের কথাই ধরা যাক। লর্ড টেনিসনের কবিতার বইয়ের জন্যে ছবি এঁকে ভেবেছিলেন মোটা টাকা––আঠারো হাজার পাউণ্ড তিনি পাবেন। টাকাটা পেলে কি করবেন? সোনার জলের চুমকি দেওয়া চকোলেট রঙের একটা গাড়ি কিনবেন। সেই গাড়ির সহিস গায়ে পরবে সবুজ রঙের জামা, চোখে আঁটবে রূপোলী ফ্রেমের চশমা। তার গদি তৈরি হবে নরম নরম কেক আর বাইবেলের বাতিল অংশের কয়েকটি খণ্ড দিয়ে। এমন আবোল-তাবোল শিশুসুলভ ভাবনা তাঁর চিঠিপত্রের ছত্রে ছত্রে ছড়ানো রয়েছে।

একবার বিপদে উদ্ধার পাবার মজাদার পরিকল্পনার কথায় লিখেছেন: গভীর সমুদ্রের মধ্যে যদি কখনও ঝড়-তুফানের ভেতর পড়ে যাই, তবে আমার মত অপটু নাবিকেরও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তেমন বিপদ বুঝলে জাহাজ ছেড়ে একটি দুর্বল-চিত্ত শুশুক ভাড়া করে তার পিঠে চেপে চটপট ফিরে চলে আসব।

সর্দিকাশিতে ক্রমাগত ভুগতে ভুগতে ডাক্তারদের ওপর প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। বলতেন, একটা ব্যারোমিটার সেঁকে আর দুটো থার্মোমিটার সেদ্ধ করে ভালভাবে ধুয়ে আমার খাবার টেবিলে দিয়ে যেও।

র‍্যাবেলিয়াস, স্যুইফট্ ও জয়েসের মত লিয়ারও শব্দ নিয়ে খেলতে ভালবাসতেন। শুধু যে ভালই বাসতেন তা নয়, লিয়ার এ খেলায় সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েছেন। অন্যরা যেখানে শব্দের বানানে হেরফের ঘটিয়ে মজা করেছেন, লিয়ার সেখানে পরিচিত শব্দগুলি জুড়ে জুড়ে নানান নতুন শব্দ তৈরি করেছেন। এ অভ্যাস তিনি ছোটবেলা থেকেই রপ্ত করেছিলেন। কেবলমাত্র এলোমেলো চিন্তার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও রঙ্গপ্রিয়তার ফলেই নয়, পরিণত বয়েসে তিনি সচেতন ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন প্রচলিত ভাষা তাঁর বৈচিত্র্যময় চিন্তা প্রকাশের পক্ষে কত অনুপযুক্ত। তাই চিন্তার সত্যিকার বহিঃপ্রকাশের জন্যে চলতি ভাষার অভাবটুকু পূরণ করেছেন নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির মধ্যে। ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের বাচস্পতি মশাই। অথবা সুকুমার রায়ের বকচ্ছপ, হাঁসজারু। লিয়ার লিখেছেন: আমাকে যোগ্য বিশেষণের জন্যে হাতড়ে মরতে হয়, কখনও ঠিকঠাক শব্দ খুঁজে পাই নে। আমার ভাবনাগুলো এত এগিয়ে চলে যে প্রচলিত ভাষা তার নাগাল পায় না। এই আক্ষেপের মধ্যেই উন্মোচিত হয় তাঁর রচনা-মানসের একটি দিক।

একথাও সত্যি, তৎকালীন ফ্যাশন হিসাবে লিয়ারও যমক ও অনুপ্রাস ব্যবহারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তবে তিনি ল্যাম বা হুডের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না। এমন কি যমক ও অনুপ্রাসের মধ্যে লিয়ায়ের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত যা কৌতুকময় জগতের সীমানা পেরিয়ে আসল খামখেয়ালের রাজ্যে পিঁড়ি পেতেছে। এক চামচ উদাহরণ দিই তাঁর লেখা মূল চিঠি থেকে একটি অংশ তুলে ধরে:

This place (NICE) is so wonderfully dry that nothing can be kept moist. I never was in so dry a place in all my life, when the little children cry, they cry dust and not tears. There is some water in the sea but not much : all the wet-nurses cease to be so immediately on arriving :— Dryden is the only book read—the neighbourhood abounds with Dryads and Hammerdryads : and weterinary Surgeons are quite unknown.

তাঁর সৃষ্ট শব্দাবলীর German, Gerwomen, Gerchildren-এর অর্থ কাউকে বুঝিয়ে দিতে হয় না। তিনি Hippopotamus-এর বহুবচন স্থির করেছিলেন Hippopotamice. বাচ্চা জিরাফ বুঝিয়েছিলেন জিরাফিনো (Geraffino) শব্দে।

নিজের আক্ষেপের কথাই এক জায়গায় রঙ্গ করে লিয়ার লিখেছেন: I went to the city to-day ; to put the 125 I got for the Book of Nonsense' into the funds. It is doubtless a very unusual thing for an artist to put by money, for the whole way from Temple Bar to the Bank was crowded with carriages and people — So immence a sensation did this occurance make. And all they way back it was the same which was very gratifying.

গান ছাড়া যেমন রবীন্দ্রনাথকে ভাবা যায় না, লিয়ারের ক্ষেত্রে তেমনি লিমেরিক। কোন কোন সময়ে শব্দ দুটি তো সমার্থকই হয়ে উঠেছিল। লিয়ার লিমেরিকের স্রষ্টা ছিলেন কিনা সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করার আগে দেখা যাক লিমেরিক শব্দটা কি অর্থ বহন করছে। লিমেরিক তো পশ্চিম আয়ারল্যাণ্ডের একটি জায়গার নাম। তবে কি সেখান থেকেই কথাটা

এসেছে? ইংরেজী ভাষার বিশিষ্ট অভিধান NEW STANDARD DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE লিমেরিকের পরিচয়ে বলছে;

আয়ারল্যাণ্ডে ভোজের আসরে অংশগ্রহণকারীদের কারও তাৎক্ষণিক রচিত গান, যার শেষে সকলে মিলে কোরাসে গায়, 'লিমেরিকে আসবে কি?' এর দ্বারা মনে হয় লিমেরিক শব্দটির উৎপত্তি সেখান থেকেই।

অথচ ENCYCLOPEADIA BRITANICA দেখছি সে সিদ্ধান্ত রীতিমত বাতিল করে দিয়েছে। তাতে স্পষ্টই বলা হয়েছে: 'লিমেরিকে আসবে কি?' ভোজসভায় গীত এই ধরনের কোন গানের হদিশ যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে না, সেই কারণেই এ তত্ত্ব স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

NEW STANDARD ENCYCLOPEDIA-র পাতায় দেখেছি লিখেছে: লিমেরিক হচ্ছে এক ধরনের আজগুবি এবং হাস্যকর কবিতা। এডওয়ার্ড লিয়ারকেই এর উদ্ভাবক বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ লিয়ারের কৃতিত্বের অসংকোচ স্বীকৃতি দেওয়া হল।

এবারে বরং লিমেরিকের একমাত্র সংগ্রাহক ল্যাংফোর্ড রীড, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছেন লিমেরিকের ইতিহাস, এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যটুকু অনুধাবন করা বঞ্ছনীয়। তিনি বলেছেন:

The peculiar form of verse was brought direct to Limerick by the returned veterans of the Irish Brigade, who where attached to French army from a period of nearly 100 years from 1691. The Brigade organized in Limerick and then disbanded was no doubt responsible for giving currency to many rude barrack room songs ; but evidence of a French origid for the five line metrical scheme of the limerick rests upon many feeble foundation… … …But this would not account for the famous limericks of Edward Lear in his Book of Nonsense (1846), where the last line is merely a choric repetition employing some of the previous rhymes and adding little or nothing to the sense. In spite of this defect, Lear certainly gave to what is known as the limericks its modern popularity—some even assert that learick is the proper form of the word.

বস্তুত এত কথার পর এ সত্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না যে ডিকারি ডিকিরি ডক, নামক ছড়া, যা নাকি কোন কোন মহলের দাবিতে প্রথম লিমেরিকের মর্যাদা পেয়েছে তা পঞ্চপদাবলীর গণ্ডি ছেড়ে লিমেরিকের আসরে ঢুকতে পারে নি এবং এডওয়ার্ড লিয়ার লিমেরিকের পথিকৃত না হলেও তাঁর হাতেই লিমেরিকের নব রূপায়ণ প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা ও বর্তমান জনপ্রিয়তা।

